বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি

একাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সংস্করণ
এপ্রিল, ২০১৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০১৭

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

सत्यमेव जयते

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

“**আমরা, ভারতের জনগণ**, ভারতকে একটি **সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র**রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম** এবং **উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা** প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে **ব্যক্তির মর্যাদা** এবং **জাতীয় ঐক্য ও সংহতি** সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথগ্রহণ করে, **আমাদের গণপরিষদে** আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই **সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ** এবং **নিজেদের অর্পণ** করছি।”

CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC AND TO SECURE TO ALL ITS CITIZENS** :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION**.

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কর্তৃক নির্মিত এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত 'বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি' বইটি নবকলেবরে পরিবেশন করা হল। ২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম পরিবর্তিত হওয়ার পরে নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী এই গ্রন্থটি নির্মিত। এর মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা,ভাষাবিজ্ঞানের জরুরি কিছু বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হবে। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে প্রকল্প ও প্রুফ সংশোধনের রূপরেখা সন্নিবেশিত হয়েছে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জীর উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অনুদানে এই বইটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। গ্রন্থনির্মাণ ও প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিদ্যাসাগর ভবন
জানুয়ারি, ২০১৭

ড. মহুয়া দাস
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

প্র স্তা ব না

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত এবং রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত 'বাংলা : প্রথম ভাষা' পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একাদশ শ্রেণির জন্য 'বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি' বইটি প্রকাশিত হল।

সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গও। তাই একদিকে যেমন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে পৃথিবীর সব ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার অবস্থানকে বুঝে নেওয়া জরুরি তেমনই প্রয়োজন বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণার। আবার বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে বাঙালি সংস্কৃতিকে অনুভব করা যাবে না কিছুতেই।

২০১৩ সাল থেকে এই নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্ত হওয়ার পর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রথম ভাষা বাংলার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনকে আরো গভীরতর ও সর্বাঙ্গীন করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এই বইটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রয়াসের জন্য রাজ্য সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরকেও।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাস কে। এছাড়াও যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জানুয়ারি, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
(চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

মহুয়া দাস
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)

রথীন্দ্রনাথ দে
(সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

স দ স্য

ঋত্বিক মল্লিক রুদ্রশেখর সাহা
সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় মিথুন নারায়ণ বসু

প্র চ্ছ দ

সুব্রত মাজী

রূ পা য় ণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূ|চি|প|ত্র

প্রথম পর্ব

বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (প্রথম পর্যায়)

প্রথম অধ্যায় : বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পৃষ্ঠা ৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৯
তৃতীয় অধ্যায় : মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১৫
চতুর্থ অধ্যায় : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা, পৃষ্ঠা ৪৫
পঞ্চম অধ্যায় : লৌকিক সাহিত্যের নানা দিক, পৃষ্ঠা ৯৩

দ্বিতীয় পর্ব

ভাষা (প্রথম পর্যায়)

প্রথম অধ্যায় : বিশ্বের ভাষা ও পরিবার, পৃষ্ঠা ১০৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারতের ভাষা পরিবার ও বাংলা ভাষা, পৃষ্ঠা ১১৯
তৃতীয় অধ্যায় : প্রাচীন লিপি এবং বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ, পৃষ্ঠা ১৩০
চতুর্থ অধ্যায় : ভাষাবৈচিত্র্য ও বাংলা ভাষা, পৃষ্ঠা ১৪২

পরিশিষ্ট : এক

প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)

নির্দেশিকা ও নমুনা

- সটীক অনুবাদ
- সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- প্রতিবেদন রচনা
- স্বরচিত গল্পলিখন

পরিশিষ্ট : দুই

প্রুফ সংশোধন

নির্দেশিকা ও নমুনা

প্রথম পর্ব

বাঙালির শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
(প্রথম পর্যায়)

প্রথম অধ্যায়
বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন–
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন–'

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারততীর্থ' কবিতায় লিখেছিলেন। সত্যিই ভারতীয় তথা বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক বিশেষত্ব সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে এর চেয়ে স্পষ্ট কথা আর কিছু হয় না। তাই ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' বইয়ের গোড়ায় বাঙালির জনতত্ত্ব আলোচনার শুরুতেই এই কবিতাটিকে উদ্ধৃত করে আলোচনার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। আমরাও সেই পথই অনুসরণ করলাম। কেননা অনেককাল থেকেই বিভিন্ন জাতির লোক নানা দিক এবং নানা দেশ থেকে এদেশে এসে মিলে মিশে আধুনিক ভারতীয় জাতির জন্ম দিয়েছে। আর আমাদের বঙ্গদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানেও বিভিন্ন সময়ে ভারতের বাইরের ও ভিতরের অন্যান্য অংশের মানুষ এসেছে এবং রূপান্তরের বহু স্তর পেরিয়ে আজকের বাঙালির জন্ম দিয়েছে। এই রূপান্তর বহু যুগের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সময়ের ফসল, স্বাভাবিকভাবেই এর নানা বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক এবং পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদও আছে। এই সমস্ত কিছুকে স্বীকার করে নিয়েই, আমরা বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের একটি সর্বসম্মত কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করব। বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস জানার আগে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নিরূপণের উপায় :

তোমরা হয়তো খেয়াল করে থাকবে, দুজন মানুষকে সাধারণত একরকম দেখতে হয় না। দুজনের চেহারা ও অবয়বের নানারকম অমিল আমরা লক্ষ করে থাকি। কিন্তু এই ব্যক্তিগত তফাত থাকলেও নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন - 'কোনো এক বিশেষ জনসমষ্টির মধ্যে এমন কতকগুলো চেহারা ও অবয়বগত সাদৃশ্য থাকে, যার দ্বারা তাদের এক বিশেষ পর্যায়গত করা চলে এবং কোনো বিশেষ জনশ্রেণির মধ্যে অবয়বগত সাদৃশ্য নিরূপণ করে তাদের নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করাই নৃতত্ত্ববিদগণের কাজ।'[১] 'নৃতাত্ত্বিক পর্যায়' বলতে আমরা সেই জনসমষ্টিকে বুঝি যাঁদের জিন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিরিখে চেহারা ও অবয়বগত কিছু বিশিষ্ট সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্যগুলি মোটামুটিভাবে এরকম—

১. মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রং।
২. গায়ের রং।
৩. চোখের রং এবং বৈশিষ্ট্য।
৪. দেহের দৈর্ঘ্য।
৫. মাথার আকৃতি।
৬. মুখের গঠন।
৭. নাকের আকার।
৮. রক্তের বর্গ বা Blood Group।

সুতরাং, প্রথমেই চুলের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট করা যাক। সাধারণভাবে তা তিন প্রকার : (ক) সোজা চুল, যা মঙ্গোলীয় জাতিগুলির মধ্যে দেখা যায়। (খ) কোঁকড়া চুল, যা নিগ্রো জাতিগুলির মধ্যে দেখা যায়, আর (গ) ঢেউ খেলানো চুল, যা পৃথিবীর বাকি জাতিগুলির মধ্যে দেখা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, বহু বছরের রক্তের সংমিশ্রণে এই বৈশিষ্ট্য অনেকটা লোপ পেলেও, খন্ডিত চুলের আনুবীক্ষণিক পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। এরপর আসি গায়ের রঙের কথায়, মানুষের গায়ের রঙের বিভিন্ন উপবিভাগ বাদ দিলে সাধারণভাবে এটি তিন প্রকার: (ক) ফর্সা বা সাদা (খ) কালো ও (গ) পীত। যদিও নৃতাত্ত্বিকেরা চুল ও চোখের চেয়ে মানুষের গায়ের রংকেই নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সময় বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেন।

মানুষকে দেহের দৈর্ঘের নিরিখে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (ক) বামন : ১৪৮০ মিলিমিটারের কম উচ্চতা যাদের। (খ) বেঁটে : যাদের উচ্চতা ১৪৮০ থেকে ১৫৮১ মিলিমিটারের মধ্যে। (গ) মাঝারি : যাদের উচ্চতা ১৫৮২ থেকে ১৬৭৬ মিলিমিটারের মধ্যে। (ঘ) লম্বা : যাদের উচ্চতা ১৬৭৭ থেকে ১৭২০ মিলিমিটারের মধ্যে। (ঙ) খুব লম্বা : ১৭২১ মিলিমিটারের উপর উচ্চতা যাদের। আবার মানুষের মাথার আকৃতি বা আকারকে শির-সূচক সংখ্যা বা cephalic index দিয়ে বোঝানো হয়। (চিত্র ১)।

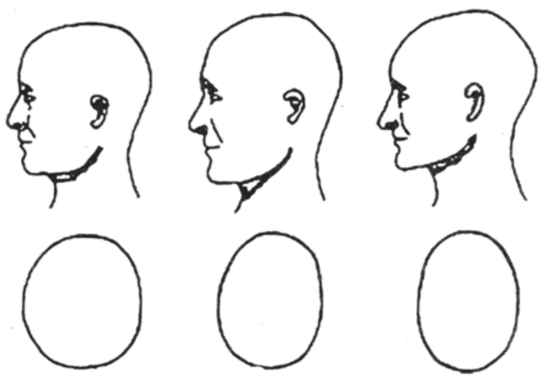

গোল বা বিস্তৃত মাথা (brachycephalic) | মাঝারি মাথা (mesocephalic) | লম্বা মাথা (dolichocephalic)

এই সূচক মানুষের মাথার সামনের দিক থেকে পেছনের দিক অবধি মানুষের মাথার দৈর্ঘ্যের দিকের সঙ্গে প্রস্থের দিকের মাপের শতকরা অনুপাতকেই বোঝায়। এ অনুপাতের ভিত্তিতে মানুষের মাথাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) লম্বা মাথা : ৭৫ শতাংশের কম অনুপাত। (খ) মাঝারি মাথা : ৭৫ থেকে ৮০ শতাশের কম অনুপাত। (গ) গোল বা বিস্তৃত মাথা : ৮০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি অনুপাত। ঠিক একইরকমভাবে মানুষের নাকের আকারেরও পরিমাপ করা হয়। নাকের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত, দৈর্ঘ্যের তুলনায় চওড়ার দিকের মাপের শতকরা অনুপাতকেই এক্ষেত্রে নাসিকা-সূচক সংখ্যা বা nasal index বলা হয়। এই অনুপাতের ভিত্তিতে মানুষের নাককে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) লম্বা সরু নাক: ৫৫ থেকে ৭৭ শতাংশ। (খ) মাঝারি নাক : ৭৮ থেকে ৮৫ শতাংশ। (গ) চওড়া নাক : ৮৬ থেকে ১০০ শতাংশ। আবার দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের চারিত্রিক মিল থাকলে তাদের নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গতভাবে একই জ্ঞাতিভুক্ত বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও আঙুলের রেখাবিন্যাসের (fingerprints) মিলও নৃতাত্ত্বিক নিবিড়তার প্রতীক।

তবে মনে রাখতে হবে নৃতাত্ত্বিকেরা উপরে আলোচিত চেহারা ও অবয়বগত বিভিন্ন দিকগুলির বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার সমষ্টিগত ফলের নিরিখে কোনো একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান। আর এই জন্য তাদের একই জাতিভুক্ত বহু লোকের বিভিন্ন পরিমাপ সংগ্রহ করতে হয়।

ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ ও অবস্থান :

১৯০১ সালে ভারতবর্ষে লোকগণনার সময় ভারতের বিভিন্ন জাতির প্রথম নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয়। সেই সময় ভারতীয় নৃতত্ত্ববিভাগ এবং লোকগণনা সম্পর্কিত দপ্তরের সর্বময় কর্তা হার্বার্ট রিজলির নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশীয় কর্মচারির মাধ্যমে এই কাজ হয়। এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত অনেকেই নৃতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ না হওয়ায় এই রিপোর্টের বিষয়ে পরবর্তীকালে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু যেহেতু নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ বিষয়ক প্রথম প্রামাণ্য কাজ এটাই, তাই এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে এর বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ত্রুটিবিচ্যুতি থাকায় এবং এর পরে নৃতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা আরও অগ্রসর হওয়ায় ১৯৩১ সালে লোকগণনায় নিযুক্ত চিফ কমিশনার হাটন ও নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন করে আলোকপাত করার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

নৃতাত্ত্বিকদের মতে ভারতীয় জনসমূহের প্রথম স্তর নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো। হাটন, বিরজাশঙ্কর গুহ, লাপিক প্রমুখ আসামে অঙ্গসি নাগা এবং দক্ষিণ ভারতের কাদার ও পুলায়ানদের মধ্যে নিগ্রোবটু রক্তপ্রবাহ স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। যদিও তাদের দেহবৈশিষ্ট্য কেমন ছিল তা এখন বলা মুশকিল, কেননা তা বহুকাল আগেই বিলীন হয়ে গেছে। আর কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক মতে আবার, নিগ্রোবটুদের মতো দেহলক্ষণযুক্ত একটি নরগোষ্ঠী ছিল ঠিকই তবে এরা নিগ্রোবটু নরগোষ্ঠীভুক্ত কিনা তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। সুতরাং, নিগ্রোবটুদের প্রসঙ্গ তর্কসাপেক্ষে বাদ দিলে এর পরেই ভারতের আদিম অধিবাসী হিসেবে আদি অস্ত্রালদের (Proto- Australoid) কথা বলতে হয়। 'আদি-অস্ত্রাল' বলার কারণ অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের রক্তের ও দৈহিক গঠনের মিল। নৃতাত্ত্বিকদের মতে আনুমানিক ৩০,০০০ বছর আগে এরা প্রথম ভারত থেকে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, মেলানেশিয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই জাতির লোকেরা বেঁটে, কালো, মাথা লম্বা থেকে মাঝারি, চওড়া ও চ্যাপটা নাক এবং ঢেউ খেলানো তামাটে চুলযুক্ত। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের কোল, ভিল, মুন্ডা, চেঞ্চু, কুরুব প্রভৃতি এবং রাঢ় বাংলার সাঁওতাল, ভূমিজ মুন্ডা ইত্যাদি আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠীরই লোক। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও পুরাণে 'নিষাদ' জাতির যে বিবরণ পাই তা এই আদি অস্ত্রালদের সঙ্গে অনেকখানি মেলে আর সিংহলের ভেড্ডা নরগোষ্ঠীও এই গোষ্ঠীরই শাখা। এরপর বাইরে থেকে প্রথম ভারতে এসেছিল যে নরগোষ্ঠী তারা হল ভূমধ্য নরগোষ্ঠী (Mediterranean)। এরা যে ভাষায় কথা বলত সেই ভাষার নাম দ্রাবিড় আর সেই থেকে এদেরও সাধারণভাবে বলা হতে থাকে দ্রাবিড়। এদের আকার মাঝারি, লম্বা মাথা, পাতলা গড়ন, ছোটো নাক, গায়ের রং কালো। আদি মিশরীয়দের সঙ্গে এদের মিল পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের 'পনি'রা এই নরগোষ্ঠীর লোক বলে নৃতাত্ত্বিকদের অনুমান। মহেঞ্জোদারোয় আদি-অস্ত্রাল ও দ্রাবিড় এই দুই শ্রেণির নরগোরই মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। দ্রাবিড় অনুসরণেই এর পর ভারতবর্ষে এসেছিল

চিত্র ২ ঃ নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো

চিত্র ৩ : আদি-অস্ত্রাল
(Proto-Australoid)

আলপীয়রা (Alpinoid)। এদের ভাষা আর্য। গায়ের রং ফর্সা অথচ বাদামি আভাযুক্ত, গোল বা বিস্তৃত মাথা, চুল ও চোখ কালো, দেহ মাঝারি বা দীর্ঘ। নৃতাত্ত্বিকদের অনুমান আলপীয়রা মধ্য এশিয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে জন্মলাভ করেছিল। এদের একদল এশিয়া-মাইনর থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে এগোতে থাকে, এভাবে সিন্ধু- কাথিয়াবাড়- গুজরাট-মহারাষ্ট্র হয়ে তামিলনাড়ু পৌঁছোয়, আর একদল পূর্ব উপকূল ধরে ওড়িশা ও বাংলায় এসে পৌঁছোয়। ‘‘বস্তুত, বাঙলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় সমগ্র মূল রূপায়ণই প্রধানত অ্যালপাইন ও আদি-অস্ট্রেলিয়, এই দুই জনের লোকদের কীর্তি।’’[২] বৈদিক সাহিত্যে যে অসুরদের উল্লেখ পাওয়া যায় তারা সম্ভবত এই নরগোষ্ঠীর লোক। তবে যে নরগোষ্ঠী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্‌গাতা, যারা আগেকার ভারতের সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে নবরূপ দান করেছিল, তারা হল আর্য ভাষাভাষী নর্ডিক গোষ্ঠী। এরা ২০০০-১৫০০ খিস্ট্র পূর্বাব্দের মাঝামাঝি কোনো সময়ে উত্তর এশিয়া থেকে ভারতের দিকে এগিয়ে এসে গণ্টনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উত্তর ভারতে ভূমধ্যীয় (দ্রাবিড়) জাতির সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘটে। এদের দেহ বলিষ্ঠ, ফর্সা, মাথা ও নাক লম্বা, ভারী দেহ। বেদের রচয়িতা এরাই। এছাড়া ভারতবর্ষে মঙ্গোল-উদ্ভূত প্রত্ন-মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর অস্তিত্বও লক্ষ করা যায়। এদের মুখ ছোটো, চ্যাপ্টা নাক, ছোটো চোখ এবং দেহে-মুখে চুল প্রায় নেই বললেই চলে। এদের দৈহিক উচ্চতা মাঝারি, আর গায়ের রং কিছুটা বাদামি ও পীত মেশানো। বেদে বর্ণিত ‘কিরাত’ সম্প্রদায় এই গোষ্ঠীভুক্ত। এই নরগোষ্ঠীর লোকেদের অরুণাচল, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্যে এবং হিমালয়ের পাদদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র ৪ : ভূমধ্য নরগোষ্ঠী বা দ্রাবিড়

উপরের আলোচনা থেকে ভারতীয় জনপ্রবাহের নৃতাত্ত্বিক পর্যায় সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা হল। এবার আমরা উপরোক্ত বিশ্লেষণের নিরিখে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করে নৃতাত্ত্বিকদের অনুসরণে সেই বৈশিষ্ট্যের মূল খোঁজার চেষ্টা করব।

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক সত্তার অনুসন্ধান :

প্রোটো অস্ট্রেলীয় বা আদি-অস্ত্রাল নরগোষ্ঠীর লোকেরাই যে বাংলার আদিম অধিবাসী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এই নরগোষ্ঠীর লোকেরা ‘অস্ট্রিক’ ভাষায় কথা বলত। আর ভারতের সব ভাষায় ‘অস্ট্রিক’ ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হলেও বাংলা ভাষায় এর পরিমাণ প্রচুর। যা আধুনিক বাংলা ভাষায় ‘দেশি’ শব্দ নামে পরিচিত। অস্ট্রিক ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর একটি বিশিষ্টতাই হল ‘কুড়ি’ সংখ্যাকে ভিত্তি করে উচ্চতর সংখ্যা প্রকাশ করা। এই রীতি এখনও গ্রামীণ বাংলায় প্রচলিত আছে। বর্তমানে বাংলার উপজাতিসমূহ হল বাংলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর ও সাক্ষ্যবহনকারী।

বাংলায় এদের সঙ্গে এসে মিশেছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী কিছু আগন্তুক নরগোষ্ঠী। তাই বাংলা ভাষায় অনেক দ্রাবিড় শব্দও পাওয়া যায়। আর আদি-অস্ত্রাল ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লম্বা মাথা (দীর্ঘশিরস্কতা), চওড়া নাক, খাটো শরীরের দৈর্ঘ্য—এই বিশিষ্টতাগুলি আমরা যত উচ্চশ্রেণি থেকে নিম্নশ্রেণির দিকে যাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হতে দেখব।

চিত্র ৫ : আলপীয় (Alpinoid)

এরপর বাংলায় এসেছিল আলপীয়রা। এরা আর্য ভাষায় কথা বললেও 'নর্ডিক' গোষ্ঠীভুক্ত বৈদিক আর্যভাষার থেকে তা আলাদা ছিল। আমরা আগেই বলেছি বাংলাদেশের আর্য ভাষাভাষীরাই কিন্তু বেদ বর্ণিত 'অসুর' জাতিভুক্ত নরগোষ্ঠী। যদিও আলপীয়রাও ক্ষেত্রবিশেষে আদি-অস্ত্রাল ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের সঙ্গে কিছুটা মিলিত হয়েছিল। যদিও উচ্চ শ্রেণির বাঙালিরা 'আলপীয়' পর্যায়ভুক্ত হলেও, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক সত্তা যে বিচিত্র বা মিশ্র বা সংকর তা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

বাংলার বিভিন্ন অংশের নানা শ্রেণির জনসাধারণের দেহের গঠন, চুলের বৈচিত্র্য, চামড়া ও চোখের রং, নাকের আকার, মাথার আকার ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্নতা আছে। তবে বিভিন্নতাগুলিকে অতিক্রম করে প্রধানত যে বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠে তা হল —''প্রধান প্রধান ধারার সঙ্গে উপধারা মিলিয়া এক হইয়াই বাঙালির জন-সাংকর্যের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা ভুলিলে চলিবে না।''[৩] এক্ষেত্রে খুব সংক্ষেপে আদি ও তার পরবর্তীকালের বাংলার সমাজবিন্যাস সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়া জরুরি। একদম আদিতে বাংলার সমাজ ছিল কৌমভিত্তিক। পুন্ড্র (পরবর্তীকালে পোদ), কর্বট (পরবর্তীকালে কৈবর্ত), বাগদি, হাড়ি, ডোম, বাউরি ইত্যাদিরাই ছিল সে সময়কার কৌম-ভিত্তিক জাতি। খ্রিস্টপূর্বকাল থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটলেও পালরাজাদের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মই ছিল প্রধান। যদিও গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করতে শুরু করে, যা পরবর্তীতে পালরাজাদের পরে সেনরাজাদের সময়ে স্বমহিমায় ফিরে আসে। কিন্তু পালরাজাদের চারশ বছরের রাজত্বকালে রাজধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম। এসময় জাতিভেদের কড়াকড়ি না থাকায় সব মিলেমিশে গিয়েছিল। এই সাক্ষ্য বহন করছে আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে রচিত 'বৃহদ্ধর্ম' নামক উপপুরাণ। সেন রাজত্বের কিছুকাল পরে রচিত হওয়ায় এখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলার সব জাতিকেই সংকর আখ্যা দিয়ে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে —১. উত্তম সংকর, ২. মধ্যম সংকর, ৩. অন্ত্যজ সংকর। এই তিনটি বিভাগে নাপিত, মোদক, রজক, স্বর্ণকার, চণ্ডাল, চামার ইত্যাদি মোট ৪১টি বর্ণ-উপবর্ণের কথা বলা হয়েছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন বৃহদ্ধর্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণগুলি অনেকাংশেই ব্রাহ্মণদের রচনা হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনে তাদের সংমিশ্রণের কথা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে একথা প্রমাণিত উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণরাও আসলে পুরাণে বর্ণিত উত্তম ও মধ্যম সংকর জাতির মতোই বিবিধ সংমিশ্রণের ফসল। কেননা বিভিন্ন জাতি বা বর্ণ আসলে নানা বর্ণ-উপবর্ণের অনুলোম[৪] কিংবা প্রতিলোম[৫] বিবাহের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। পুরাণ বা শাস্ত্রে উল্লিখিত অনেক জাতিরই বাস্তব অস্তিত্ব বাংলায় ছিল না (যেমন

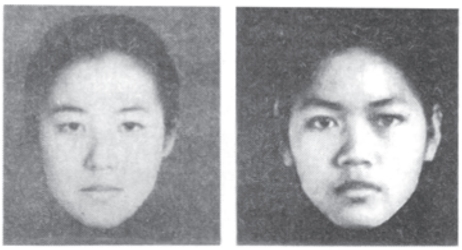

চিত্র ৬ : প্রত্ন-মঙ্গোলয়েড (Proto-Mongoloid)

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) কিন্তু তা থেকে এই সত্য স্পষ্ট বোঝা যায় "বাংলার জাতিসমূহ যে মাত্র নানাজাতির রক্তের মিশ্রণের ফসল তা নয়, পুনর্মিশ্রণের ফল।"[৬]

নৃতাত্ত্বিকেরা বাংলার জনসমূহের যে সমস্ত পরিমাপ গ্রহণ করেছেন, তা থেকে মনে হতে পারে এরা কেউই গোল মাথার নয় বরং মাঝারি আকারের মাথার লোক। তা হওয়াই স্বাভাবিক কেননা আলপীয়দের সঙ্গে দেশজ লম্বা মাথার নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছিল আমরা আগেই বলেছি। আর এই সংমিশ্রণ গড় পরিমাপকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু শির-সূচক সংখ্যার (cephalic index) বিস্তৃতির দিকে নজর করে নৃতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করেছেন উত্তর বা দক্ষিণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র—এইসব পর্যায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যে গোল মাথার একটা ধারা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে পরিমাপের কিছুটা হেরফের সত্ত্বেও যে সমস্ত জাতিকে নৃতত্ত্ববিদরা একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন তারা হল—(১) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও সদ্‌গোপ (২) গোয়ালা, কৈবর্ত ও পোদ (৩) সাঁওতাল, মুন্ডা, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিসমূহ। আর একটি আশ্চর্যের দিক হল নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের দিক থেকে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মতো উচ্চবর্ণের লোকেদের সঙ্গে নম:শূদ্রের কোনো পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও সমাজে এদের স্থান সবচেয়ে নীচে। কেন? এই ঘটনার প্রকৃত যুক্তি হয়তো প্রচ্ছন্ন আছে বাঙালির সমাজ-রাজনৈতিক ইতিহাসের গর্ভে। কেননা নৃতত্ত্বে এর কোনও যুক্তি নেই। একইরকমভাবে নৃতত্ত্বের যুক্তিতে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানেরা প্রায় সমগোত্রীয়। এছাড়া উপজাতিগুলির আলোচনাকালে তাদের মোটামুটি প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) আদি-অস্ত্রাল যেমন সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, মহালী, করমালী, শবর, পাহাড়িয়া, বেদিয়া ইত্যাদি। (২) মঙ্গোলীয় লেপচা, মেচ, ভুটিয়া, রাভা, চাকমা ইত্যাদি। নৃতাত্ত্বিকেরা আরও দেখিয়েছেন উত্তরে জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের মধ্যে কেমন মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে আর পশ্চিম দিনাজপুরে দ্রাবিড়ীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। সাঁওতাল ও মুন্ডাদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ থেকে বাগদি ও বাউরিদের মধ্যে প্রকৃত আদি-অস্ত্রাল প্রভাব দেখা যায়। আবার পোদ সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের তেমন কোনো তফাত পাওয়া যায় না।

সুতরাং, বাংলার জনসমূহের আলোচনাকালে জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণের সময় আঞ্চলিক প্রাধান্যকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন জেলার নানা বর্ণের নানা গোষ্ঠীর মানুষের সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদাভেদকে নিয়েই ঘটেছে এই বিচিত্র সংমিশ্রণ। কিন্তু বহুযুগের বহুকালের এই মিশ্রণ ও পুনর্মিশ্রণ এতই গভীর ও ব্যাপক যে অধিবাসীরা তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে আজকের আধুনিক বাঙালির জন্ম দিয়েছে, এমনটা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এত ব্যাপকভাবে ঘটেনি। আর সমন্বয়-সংমিশ্রণের এই বহমানতা আজও বিরামহীন এবং বাঙালির জীবনের চিরকালীন সত্য।

তথ্যসূচি:

১. অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* বিশ্বভারতী, বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা : ৩, ১৯৮৬,

২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২,

৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,* দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২,

৪. অনুলোম—উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মহিলার বিবাহ।

৫. প্রতিলোম—অনুলোমের বিপরীত। উচ্চবর্ণের মহিলার সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ।

৬. অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* বিশ্বভারতী, বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা : ৩, ১৯৮৬,

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সাহিত্য

ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক দিকনির্দেশ :

বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক সত্তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। পরবর্তী বিষয়ে যাওয়ার আগে প্রথমেই প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা সম্পর্কে আর একটু স্পষ্ট করে জেনে নিই। মোটামুটিভাবে বলা যায় অবিভক্ত বাংলা (পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ), বিহার (উত্তরাংশ, মিথিলা, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুর ইত্যাদি) ওড়িশা, আসাম (ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ উপত্যকা)—এই সুবিশাল অংশ জুড়েই ছিল প্রাচীন বঙ্গদেশ। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো দেশের ভৌগোলিক এলাকাও পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করে এক বৃহৎ কালখণ্ডের প্রেক্ষিতে, কোনো রাজতন্ত্রের উত্থানপতন, জয়-পরাজয়, স্থানীয় অভ্যুত্থান বা বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের নিরিখে এই পরিবর্তন এক স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় ঘটনা। তাই বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেও এই ভৌগোলিক সীমারেখার বহুবার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সেই সময়কালে বঙ্গদেশের সমগ্র এলাকা জুড়ে (পাল-বর্মন-সেন রাজাদের রাজত্বকালে) অখণ্ড বঙ্গভূমির কোনো ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছিল তা নয়। তবে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই বিস্তৃত কালপর্বে মানুষের যে ভাষা-সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ছিল, সেই বনিয়াদের ওপর ভিত্তি করেই, বাঙালির সংস্কৃতি গড়ে উঠতে শুরু করে।

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সময়কাল প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে একটি ভাঙাগড়া বা টানাপোড়েনের সময়। এই দুশো বছরের মধ্যে কয়েকশো বছর ব্যাপী স্থায়ী পালবংশের রাজত্বের অবসান হয়েছে, ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বর্মন ও সেন বংশ; এরপর আবার মুসলিম আক্রমণে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেন-রাজত্ব—সুতরাং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে, সামাজিক অস্থিরতায় আন্দোলিত এই সময়কে আমরা যুগসন্ধির (time to transition) সময় বলে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হবে না। মনে রাখতে হবে এক রাজতন্ত্রের অবসান থেকে অন্য রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মানে শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও হস্তান্তর নয়। রাজারা যে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক, সে সময় সেই সমস্ত ধর্ম রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করেছে এবং অন্য ধর্ম কোণঠাসা হয়েছে। গুপ্তযুগের সময় থেকে পাল, বর্মন ও সেন রাজাদের সময় পর্যন্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য বিস্তারের সংঘাত, উভয় ধর্মের অভ্যন্তরে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। দুই ধর্মমতের মধ্যে তৈরি হয়েছে নানা দল-উপদল ও মতবাদ এবং এই ঘরে-বাইরে বিরোধ তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এক সমন্বয় গড়ে তুলতে কখনও সাহায্য, কখনও বাধ্য করেছে। আবার জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু ব্রাহ্মণ্য (আর্য) সংস্কৃতি আমদানি হওয়ার আগে থেকেই বাংলার আদি অধিবাসীদের মধ্যে একটা নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাবধারা ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; যা বাংলার একান্ত ভেতরের জিনিস। এই প্রাক-আর্য সংস্কৃতির বহতার সঙ্গেই হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, লোকায়ত, সহজিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মমত এসে যোগ দিয়ে সংঘর্ষ এবং সমন্বয়ের একটি অন্তর্লীন কাঠামো গড়ে তোলে। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' এর ব্যতিক্রম নয়। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক সত্তা নিয়ে আলোচনার সময় আমরা এই সমন্বয় ও সংমিশ্রণকেই গভীর ও ব্যাপকভাবে লক্ষ করেছি, এবং বাঙালি সংস্কৃতির উন্মেষলগ্নে সেই একই সুর বজায় থাকতে দেখব।

চর্যাপদের আবিষ্কার :

সাংস্কৃতিক ঐক্যের একটি প্রধান উপাদান হল ভাষা। কেননা ভাষার মাধ্যমেই কোনো জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তরাধিকার প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ বাঙালির ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি কেমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তা দেখা যাক। তবে তার আগে এই 'চর্যাপদ' আবিষ্কার হল কীভাবে? তার পাঠোদ্ধার করে কী পাওয়া গেল? বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে একটি পুথি সংগ্রহ করে আনেন। অন্য দুটি অপভ্রংশ রচনার সঙ্গে একত্রে এর নাম ছিল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। এই ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে ছিল সংস্কৃত টীকাসহ ধর্মাচরণের বিধিনিষেধ বিষয়ক মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি (৪৬টি সম্পূর্ণ গান এবং ১টি খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ গান) এবং বৌদ্ধাচার্য সরোজবজ্র ও কৃষ্ণাচার্য রচিত দোহা। সাধারণভাবে লোকমুখে এটিই চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে পরিচিত। এর বেশ কিছুকাল পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নেপাল থেকেই চর্যাপদের অন্য একটি তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন। তিব্বতিতে প্রাপ্ত পদ বা গানের সংখ্যা একান্ন। যা থেকে বোঝা যায় মূল বইয়ে মোট একান্নটি পদ বা গান ছিল। যাইহোক এই চর্যাপদের আবিষ্কার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কেননা চর্যাপদ হল একই সঙ্গে বাংলা ভাষা তথা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার (NIA) প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত।

রচনাকাল :

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নানা দিক বিচার করে প্রমাণ করেছেন এই পদগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল। আর এর গীতিকারেরা সকলেই হয় প্রাচীন বাংলার অধিবাসী ছিলেন, নয় তাঁদের বাংলাদেশ ও বাঙালির জীবন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল।

কবি পরিচিতি :

চর্যাগীতি রচয়িতাদের সকলের জীবন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য যথেষ্ট নয়। বরং তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বল্প এবং পরস্পরবিরোধী। তবে তার মধ্য থেকেই আমরা জানতে পারি মোট চব্বিশ জন কবির কথা। যার মধ্যে কাহ্নপাদের (বা কৃষ্ণাচার্য) সর্বাধিক বারোটি, ভুসুকুপাদের আটটি, সরহপাদের চারটি, কুক্কুরীপাদের তিনটি, লুইপাদ-শান্তিপাদ-সবরপাদের দুটি এবং ডোম্বীপাদ, চাটিল পাদ, দ্বারিক পাদ, ধামপাদ প্রমুখের একটি করে পদ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেছিলেন এঁরা সকলেই বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে মহাযান, বজ্রযান, সহজযান, হীনযান ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা এবং সর্বোপরি তান্ত্রিক মত, চর্যার বিভিন্ন গানে নানা অভিব্যক্তি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাই এখানেও সমন্বয়ী ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। যে সমস্ত চর্যাকারেরা তাত্ত্বিক দিকটিকে প্রচ্ছন্ন রেখে সমকালীন কোনো রূপছবির সাহায্যে তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানে পদগুলি কাব্যসম্ভাবনাময় ও গীতমাধুর্যের প্রকাশক। এক্ষেত্রে ভুসুকপাদ, শবরপাদ, ঢেন্ঢনপাদ প্রমুখের নাম আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়।

কাব্যমূল্য :

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গানগুলির মূল্য আমরা বিচার করব। বৌদ্ধ সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত এবং সেই সাধনপথের আনন্দকে প্রকাশ করার জন্য এই গানগুলো লেখা, শুধু কাব্যসৃষ্টির জন্য নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই গানগুলির প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলি, আউল-বাউল-মারিফতি-মুরশিদি গানের প্রবাহ চলেছে।

চর্যাপদের প্রায় সবকটি গানই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা, অন্ত্যমিলযুক্ত এবং কোথাও কবির নাম অনুল্লিখিত থাকলেও সবক্ষেত্রে রাগরাগিণীর নির্দেশ বেশ স্পষ্ট, যেমন মল্লার, বঙ্গালি ইত্যাদি। আর চর্যায় গানগুলিতে লৌকিক জগতের যে চিত্রময় বর্ণনা আছে তা আমাদের অভিভূত করে।

শবরপাদের ২৮নং পদটি উদ্ধার করা যাক—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিন্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।।

(উঁচু উঁচু পাহাড়ে শবরী বালিকা বাস করে, শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরেছে আর তার গলায় গুঞ্জাফুলের মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করো না। আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা বৃক্ষ মুকুলিত হল। আকাশ স্পর্শ করেছে তাদের পুষ্পিত ডাল। শবরী নানা ভূষণে সেজে এ অরণ্যে একা ঘুরে বেড়ায়।)

এখানে কবির রূপানুরাগ অনবদ্য। ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জার মালায় সজ্জিত শবরী বালিকা এবং পুষ্পিত শাখায় পল্লবিত প্রকৃতির চিত্ররূপের মধ্যে শবরের প্রেমানুভূতির ব্যঞ্জনা আধুনিক কবিতা পাঠককেও আলোড়িত করে, যার আবেদন চিরকালীন। এইরকম শবরপাদের আরেকটি পদ—

....হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।।
তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্নাবাড়ী তাএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশফূলিলা।।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ-শবরে কিম্পি ন কেবই মহাসুহেঁ ভেলা।। (চর্যা ৫০)

(আমার উঁচুতে ঘর। কার্পাসফুলে তার চারপাশ ভরে গেছে। বাড়ির পাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার আলোয়

আঁধার কেটে গিয়ে যেন অজস্র ফুল ফুটেছে আকাশে। কঙ্গুচিনা ফল পেকেছে আর শবর-শবরী প্রেমাবেগে মেতে উঠেছে।)

এভাবে চর্যাপদে বারবার সাধারণ মানুষের জীবনের নিখুঁত বিবরণ কাব্যময়তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নদী, মাটি, ডালপালা, নৌকা, দাঁড়, ঘাট, অরণ্য, শবর-শবরী, ডোম্বী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন অথচ দৈনন্দিন অনুষঙ্গকে চর্যাকারেরা অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। চারপাশের চেনা জগতের ছোটো ছোটো খণ্ড মুহূর্ত, বাস্তব জীবনের দৃশ্য যেন ছায়াছবির মতো বারবার ফিরে আসে। শান্ত সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা, গোরুর দুধ দোয়া ও উষ্ণ দুধের গন্ধ, অরণ্যের আঁধারে শিকারির হরিণ ধরা, গ্রাম্য বধূর বিষণ্ণ মুখ, মাদলের আওয়াজে বোঝা যায় বর চলেছে বধূ আনতে, সেখানে স্ত্রীআচার, বাসরঘর, অথবা 'নিসি অন্ধারী মুসা অচারা'—অন্ধকারে ইঁদুরের ঘোরাফেরা এবং সর্বোপরি নদীময় বাংলার শান্ত, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গে উত্তাল সজলতার কথা নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি চিত্রধর্মিতা কবিতার একটি বিশিষ্ট দিক। বিশেষ করে মানুষ আর প্রকৃতির সহজ ও গভীর সম্পর্কের চিত্রগীতিময় মানবিক প্রকাশ চর্যাপদেই আমরা প্রথম খুঁজে পেলাম।

দার্শনিকতা ও ধর্মমত :

মনে রাখতে হলে চর্যাগীতিগুলি মূলত সাধনসংগীত। এগুলি দীর্ঘকাল নৃত্য-সহকারে গীত হত। সাধক কবিরা তাঁদের সাধনার নিগূঢ় সংকেত প্রচার করেছেন এই গানগুলির মধ্য দিয়ে। বৌদ্ধধর্মের মহাযানী শাখা পরবর্তীকালে বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান ইত্যাদি নানা শাখায় বিবর্তিত হয় এবং এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তান্ত্রিকতা। যার অনুপ্রবেশ ব্রাহ্মণ্যধর্মেও ঘটেছিল কেননা তন্ত্র, মন্ত্র ও অন্যান্য রহস্যময় গূঢ় পন্থা এসবই বাংলার আদিম কৌম সমাজের অর্থাৎ অনার্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য বিশেষত্ব। চর্যাপদে এই বিভিন্ন যানের বিবর্তিত রূপের সঙ্গে তান্ত্রিকতার সমন্বয় ও মিশ্রণ ঘটেছিল। বাংলার অন্তরের এই সমন্বয়ী রূপের কথা আমরা তাই প্রথমেই আলোচনা করেছিলাম। তবে চর্যাগীতি প্রাথমিকভাবে বৌদ্ধ দর্শনেরই প্রতিধ্বনি। আর, বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য হল এই দুঃখ-বেদনাময় মানবজীবন থেকে নির্বাণ বা মুক্তি। এই নির্বাণপ্রাপ্তির উপায় বা অবস্থাকে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের বিবর্তন। কেননা শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ—নির্বাণের এই তিনটি অবস্থা। সহজ ভাষায় বলতে গেলে সাধনার মাধ্যমে মানুষ এই মহৎ উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়। তাই চর্যাকারেরা তাদের গানে অন্তরে লীন মনোময় অনুভূতির উপরেই জোর দিয়েছেন। একথাও ঠিক চর্যায় কোথাও দেহ-সাধনার কথা আছে, তন্ত্রের প্রসঙ্গ আছে, আবার তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান, জপ ও দেহের অসারতার কথাও সাধক-কবি বলেছেন নিরাসক্ত মনে। আসলে সাধনগীতির ঐতিহাসিক বাস্তবতা হয়তো এটাই—নানা মৌলিক চিন্তাধারা ও সংশ্লেষকে সম্বল করে তা গড়ে ওঠে, পরে সেই সমস্ত গূঢ় দার্শনিক প্রসঙ্গ কালের স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমশ চাপা পড়তে থাকে; একমাত্র তার স্বতন্ত্র মানবিক আবেদনটুকু চিরকালীন হয়ে থেকে যায়। একই পথে হেঁটে বৈষ্ণব-গান, বাউলগান, মুরশিদি গান, নাথ সাহিত্যের দেহযোগের গান, শাক্তপদাবলি প্রভৃতি সাধনসংগীত হয়েও, আধুনিক মানুষের কাছে নি:সঙ্গ অসহায় মনের; বেদনাময় আকুতির শিল্পিত প্রকাশ হিসেবেই সর্বোচ্চ সমাদর পায়।

ভাষা ও উত্তরাধিকার :

চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ বলেছেন সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষা। অর্থাৎ সন্ধ্যার ম্লান আলোয় যেমন রহস্যের প্রহেলিকা থাকে, অস্পষ্টতা থাকে, তেমনই চর্যার ভাষাও আধেক স্পষ্ট আধেক অস্পষ্ট। তার কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না। মতান্তরে 'সন্ধা' শব্দের অর্থ 'সম্যক ধ্যান' অর্থাৎ সম্যক ধ্যানের মাধ্যমে যে ভাষার

পাঠোদ্ধার সম্ভব। মনে রাখতে হবে আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগের ভাষায় চর্যাপদ লেখা। সুতরাং, বাংলা ভাষার আদিম ও অপরিণত স্তরের লক্ষণ এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এই অপরিচয়ের দূরত্বকে অতিক্রম করতে পারলে, দুর্বোধ্যতার আড়াল ভেঙে আমরা গানগুলির মধ্যে যে কাব্যরস ও সমকালীন লৌকিক জগতের প্রাণবন্ত ছবি আছে তা প্রত্যক্ষ করি।

যে সময় চর্যাপদ লেখা, তখন বাংলাদেশে সংস্কৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং মাগধী প্রাকৃত লেখ্য ভাষার মর্যাদা পেত। এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন অপভ্রংশ হল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার (MIA) শেষ স্তর। লোকায়ত বা প্রাকৃত ভাষার সহজ-সরল রূপটি এই ভাষার ছাঁদে ফুটে উঠেছে। সেই সময়ের বাংলায় মাগধী অপভ্রংশের সঙ্গে সারা উত্তর ভারত জুড়ে শৌরসেনী অপভ্রংশের বহুল প্রচলন ছিল। আর 'মাগধী' অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়বঙ্গীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড়ো কিছু পার্থক্যও ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই হিন্দি, মৈথিলি ও ওড়িয়াভাষীরাও চর্যাপদের উপর তাঁদের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Origin and Development of Bengali Language' বইয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদ যে বাংলা ভাষার পূর্বসূরি তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। খুব সংক্ষেপে বললে, তাঁর যুক্তিগুলি ছিল—

১. চড়িলে, জান্তে, বুঝিআ প্রভৃতি শব্দে—ইলে, —ইতে, —ইয়া যোগ করে অসমাপিকা পদ সৃষ্টি। ২. ভইল, জিতেল প্রভৃতি শব্দে —ইল যোগ করে অতীতকালের ক্রিয়াপদ গঠন। ৩. করিব, যাইবে—ইব যোগ করে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ গঠন। ৪. এক, দুই, চৌষঠ্‌ঠী প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের রূপ। ৫. ডোম্বীএর, হরিণার প্রভৃতি—এর, —অর বিভক্তি যোগে সম্বন্ধ পদ সৃষ্টি। ৬. বাহবকে, গঅবঁরে ইত্যাদি গৌণ কর্মে—কে, ক, রে বিভক্তির প্রয়োগ। ৭. সাঙ্গ, মাঝ, অন্তর ইত্যাদি অনুসর্গের পদ হিসেবে ব্যবহার। ৮. 'অপনা মাংসে হরিণা বৈরী' (নিজের মাংসের জন্য হরিণ নিজেরই শত্রু), বর সুন গোহালী কিসো দুট্‌ঠ বলন্দে (দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো) প্রভৃতি বাংলার একান্ত নিজস্ব বাগ্‌ধারার প্রয়োগ।

এইসব ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং সহজ কোমল নদীময় বাংলার রূপচ্ছবি থেকে নি:সংশয়ে প্রমাণিত হয় চর্যাগীতি বাংলা ও বাঙালির প্রাচীনতম পূর্বসূরি।

সমাজ ও লৌকিক জীবন :

আমরা এই অধ্যায়ের আরম্ভেই চর্যাগীতির সমকালীন সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কেননা এই গানগুলির বস্তুগত খুঁটিনাটির মধ্যে প্রাচীন বাংলার লৌকিক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। সে সময়ে দরিদ্র নিম্নবিত্ত বাঙালির জীবনে দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না।

'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী।।
বেংগ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে যামায়।। *(চর্যা ৩৩ / ঢেন্ঢন পা)*

(অর্থাৎ টিলার উপরে আমার ঘর, সেখানে প্রতিবেশী নেই, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য উপবাস। অথচ ব্যাঙের সংসার ক্রমশ বেড়েই চলে।) এখানে লক্ষণীয় বাঙালির প্রিয় খাদ্য এই ভাত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে আদি-অস্ত্রালদের প্রধান খাদ্যবস্তু ছিল ভাত। বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে ভাতের এই ভূমিকা আদি-অস্ত্রালদের কাছ থেকেই পাওয়া, পরে যা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে। এছাড়াও পরনের ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা কলসি, জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের চাল উড়ে যাওয়া, মাটির দেয়াল গলে পড়ার ছবি—এক লহমায় শবর-শবরী, ডোম-ডোমনী, নিষাদ প্রভৃতি সমাজের প্রান্তীয় মানুষগুলির নি:স্ব নিরানন্দময় জীবনের দৈনন্দিন বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তোলে। এই অভিশাপগ্রস্ত জীবনে একমাত্র বিনোদন ছিল যূথবদ্ধ নাচ, গান এবং গ্রামীণ উৎসব। তাই যৌথ নাচ-গানের প্রসঙ্গ বারবার বিভিন্ন চর্যাগানে ফিরে ফিরে আসে। আর সেইসঙ্গে ঘর-গেরস্থালি আর বিবাহের প্রসঙ্গও এসে যুক্ত হয়। মাদল বাজিয়ে বরের বিয়ে করতে যাওয়া, কর্পূর দিয়ে পান খাওয়া এবং বধূসাজে অলংকৃত রমণীর বাসরঘরে অন্যান্য মেয়েদের ভিড় করার ছবিও কবিতায় অনায়াসে উঠে আসে। সে সময়ও বিবাহে বরপক্ষ যৌতুক নিত এবং বেশি যৌতুকের লোভে নীচজাতের মেয়েকে বিয়ে করতেও দ্বিধা করত না। এই সত্য কাহ্ন পা ('ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।' চর্যা ১৯) ডোমবীকে বিয়ে করার মধ্যে দিয়ে পাঠককে জানিয়েছেন। তখনকার দিনে রাত্রে চোর-ডাকাতেরও উপদ্রব ছিল, মধ্যরাতে চোর বউয়ের কর্ণাভরণ খুলে নিয়ে যায় ('দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।' চর্যা ২)। তাই চোর আটকানোর জন্য প্রহরীরও প্রয়োজন হত ('সুন বাহ তথতা পহারী।' চর্যা ৩৬)। সমাজে শ্রেণিভেদ, বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা ছিল। ডোম, নিষাদ, শবরেরা গ্রামের বাইরে, উঁচু টিলায় বাস করত। এই প্রান্তবাসী মানুষদের বৃত্তি ছিল তুলো ধোনা, দই বানানো, মদ বিক্রি, মাছধরা, নৌকা চালানো, পশুপাখি শিকার, জাদুবিদ্যা, সাপের খেলা দেখানো ইত্যাদি। আর ধনীর ঘরে সোনারুপোর অভাব ছিল না। তারা বেশ আড়ম্বর করে মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করে পুজো করতেন। —এই ধরনের নানান টুকরো লোকজীবনের ঘটনা-মুহূর্ত ও কৃষিনির্ভর নদীময় গ্রামীণ বাংলার ছবি দিয়ে চর্যাগীতিগুলো গড়া। সেখানে উচ্চবর্ণের মানুষদের পরিবর্তে প্রান্তিক-অনার্য-অতি সাধারণ মানুষের তথাকথিত অমার্জিত জীবন; সমাজ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও অবক্ষয়ের দুর্বিপাকেও সুখ দুঃখের আলো-আঁধারিতে ভরা তাঁদের বেঁচে থাকার ঐতিহাসিক উজ্জ্বলতা ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। বাংলা কবিতায় চর্যাগীতির হাত ধরেই নিঃস্ব, অন্ত্যজ, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কথা সাহিত্যের আঙিনায় এসেছিল, একথা আজ আমরা বলতেই পারি।

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী 'অন্ধকারময় যুগ'। সাহিত্য রচনার কোনো অনুকূল পরিবেশ, সামাজিক স্থিতি সে সময়ে ছিল না। তুর্কি বিজয়ের ফলশ্রুতিরূপে বাংলাদেশে যে প্রবল সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তাতে সেই সময়পর্বে কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি; বরং পরবর্তী সময়ের জন্য সুযোগ্য প্রস্তুতিই যেন এই কালপর্বে সংঘটিত হয়েছিল, যার প্রকাশ ও পরিপূর্ণতা কয়েক শতাব্দী ধরে দেখা গেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' বলতে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে বোঝায়। মধ্যযুগের কাব্যভাবনা ও রচনার বিবর্তনের পথরেখা অনুসরণ করে এই যুগের সাহিত্যকে তিনটি প্রধান উপচ্ছেদে ভাগ করা যায়—

(এক) প্রাক-চৈতন্য পর্ব অর্থাৎ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী পর্ব (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী),

(দুই) চৈতন্য পর্ব (ষোড়শ শতাব্দী),

(তিন) চৈতন্যোত্তর পর্ব (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী)।

সমগ্র মধ্যযুগ তো বটেই, আধুনিক যুগের জীবন ও সাহিত্যচিন্তা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের বিপুল, সর্বাতিশায়ী প্রভাবে এমনভাবে প্রভাবিত, যার তুলনা সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই অতুলনীয়। সেই কারণে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাকে তাঁরই নামাঙ্কিত করে উপবিভাগ করা হয়ে থাকে। প্রাক-চৈতন্যযুগে রচিত সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখ্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলি, তিনটি 'আদি মনসামঙ্গল কাব্য'। উত্তর-চৈতন্য যুগের সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের ধারা, কাশীদাসী মহাভারত, চৈতন্য – জীবনীসাহিত্য, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি, আরাকান রাজসভাশ্রিত কবিদের কাব্য, শাক্ত পদাবলি প্রভৃতি। পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭) বা ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০) থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে যুগসন্ধিক্ষণ (মধ্য থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের) বলা হয়।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে যে বাংলা সাহিত্যের সূচনা, তার প্রতিষ্ঠা পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি যে তখন মূলত রাজকীয় মর্যাদার উপর নির্ভরশীল থেকেছে, তা তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছ। বাংলা ভাষার জন্মমুহূর্তে তা পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। সেই সময়ে বাংলা ভাষায় গীতিকবিতার আকারে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের তথা সহজিয়াদের যে গানগুলি রচিত হয়েছিল, 'চর্যাগীতি' নামে পরিচিত সেই গানগুলিই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মসাধনার বিচারে চর্যাগীতি বাঙালি জাতি ও তার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পদ।

গৌড়বঙ্গে সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সেই গীতধারা এদেশে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক সেন রাজারা সংস্কৃতির বাহনরূপে সংস্কৃতকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ায় বাংলা ভাষা রাজদরবার থেকে নির্বাসিত হয়ে লোকজীবনকে আশ্রয় করেই আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। তোমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই

বিস্তৃতভাবে জেনেছ যে, সে ভাষায় সাহিত্য কিছু রচিত হলেও তা ছিল অনভিজাত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শ্রেণিহীন বৌদ্ধ, বর্ণহীন শৈব, অন্তঃপুরচারিণী এবং তথাকথিত শূদ্রেরাই ছিলেন তার ধারক ও বাহক। তাদের সাহিত্যের অধিকাংশই আবার লৌকিক ছিল বলেই, ছিল মৌখিকও। ছড়া, কথা, গানের আকারে সেই সাহিত্যের প্রচুর নিদর্শন এখনও বাংলার লোকসাহিত্যে প্রচলিত আছে। এই বিষয়টি তোমরা বইয়ের 'পঞ্চম অধ্যায়ে' বিস্তারিতভাবে জানবে।

দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এদেশে তুর্কি আক্রমণ শুরু হলে কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। বর্ণভেদ, বংশ কৌলীন্যের ভেদ নানাবিধ সংস্কারে প্রায়-নিঃশেষিত প্রাণশক্তির হিন্দুরা লুণ্ঠন ও ধর্মান্তরিকরণের সেই সন্ত্রাসের সময়ে পুথি নিয়ে কেউ নেপাল-তিব্বতে আশ্রয় নিলেন, অনেকে রাজশক্তির অনুগ্রহভিক্ষার আকর্ষণে ধর্মান্তরিত হলেন। কেউ বা ওড়িশা ও মিথিলার কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়লেন। এই সময় বৌদ্ধদের সঙ্ঘারামও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত হয়ে শূদ্রদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন।

প্রায় দেড়শ বছর গৌড়বঙ্গ-বিজেতা সুলতানদের জীবনচিত্র দেখলে বোঝা যায় তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের প্রকৃত চেহারা। সেখানে শুধুই গৃহবিবাদ, ষড়যন্ত্র, পদচ্যুতি, হত্যা। তাই অশান্তি ও অরাজকতার এই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়নি। দীর্ঘকালের বিপর্যয় ঘুচে গিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালীর সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ লক্ষ করা গেল ভাষায়, গীতে ও পাঁচালী কাব্যে।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ গৌড়বঙ্গে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করলে, তখন থেকেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি নতুন পথ ধরে এগোনোর সুযোগ পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইলিয়াস শাহী ধারার সাময়িক পতন ঘটে। হিন্দুরাজা দনুজমর্দনদেব আপন শক্তি ও প্রতিভাবলে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করলে তাঁরই আনুকূল্যে হিন্দুশাস্ত্র ও বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। তাঁর পুত্র যদু 'জালালুদ্দিন' নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন এবং তাঁর পরে ইলিয়াস শাহী বংশই আবার গৌড়ের অধিকার লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৪৮৪) এই বংশই নানাদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে যান। এরপর কয়েক বছর হাবসী খোজাদের উত্থানে শান্তি বিঘ্নিত হয়। তারপর গৌড়ের সিংহাসনে বসেন সম্রাট হোসেন শাহ (১৪৯৩-৯৪)। হিন্দু কবিদের ভাষায় তিনি ছিলেন 'নৃপতিতিলক'। তাঁর সময় থেকেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এদেশে যে সাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে, তাতে দুটি সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সমন্বয় স্পষ্ট লক্ষ করা যায়—এক, লৌকিক সংস্কৃতি এবং দুই, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। বঙ্গদেশে লৌকিক সংস্কৃতির ধারাটিই প্রাচীনতর। এদেশে আর্য অধিকার বিস্তৃত হওয়ার আগে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ও মোঙ্গল গোষ্ঠীর জনতা বাস করতেন। ভারতীয় ধর্মসাধনায় যোগ ও তন্ত্রমতে সাধন এঁদেরই দান বলে অনুমান করা হয় ('প্রথম অধ্যায়' এবং 'দ্বিতীয় অধ্যায়' দ্রষ্টব্য)। ইহলোকের চেতনা ও সমৃদ্ধি এঁদের জীবনবোধের অঙ্গ ছিল। অলৌকিক সিদ্ধি অর্জন করা ছিল ধর্মসাধনের প্রধান লক্ষ্য। এঁরা তুকতাক মন্ত্র ও মুষ্টিযোগে বিশ্বাস করতেন। গাছে ও পাথরে দেবকল্পনাও এঁদের ধর্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য ছিল। এঁদের সাহিত্য মৌখিক সাহিত্য—যার পরিচয় বিধৃত রয়েছে এঁদের ছড়ায়, গানে, লোককথায়।

যখন এদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটল, বেদ-পুরাণের সংস্কার হল, স্মৃতি-শাস্ত্রের বর্ণাশ্রম বিধান এল, এল সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য ধারা, তখন প্রাণধর্মে চঞ্চল লৌকিক সংস্কৃতি ধারার সঙ্গে সুউচ্চ দার্শনিকতা ও

সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সংঘাত তৈরি হল। যাতে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্রোত প্রাণধর্মকে ভাসিয়ে দিল। সমাজের উচ্চ মঞ্চে অভিজাত বর্ণ অধিষ্ঠিত রইলেন। নিম্নস্তরে রইলেন লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস নিয়ে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের দল। বাংলাদেশে দেখা যায়, সংস্কৃতির এই দুই ধারার মিশ্রণ সুপ্রাচীন কাল থেকেই ঘটে আসছে। সংস্কৃত পুরাণ স্মৃতির শাসন যেমন নিম্নস্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তেমনই 'শূদ্র' ও মহিলাদের মাধ্যমে লৌকিক সংস্কৃতি উচ্চস্তরের হিন্দুদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। বর্ণ হিন্দুদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে 'স্ত্রী আচার' একটি অবশ্যপালনীয় বিশিষ্ট অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই স্ত্রী-আচারের ভিত্তি লৌকিক আচারবিচার। এই প্রসঙ্গে আর্যসমাজে কিছু লৌকিক দেবদেবীর অনুপ্রবেশও স্মরণীয়। বটগাছে কুবের-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কল্পনা ও জাগরণ উৎসব দ্বারা 'কোজাগর' লক্ষ্মীর আরাধনা, 'দুর্গাপত্রী' (বিন্নী ধানের গাছ বা বেলপাতা) নিয়ে রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি উল্লেখ, দ্বাদশ শতাব্দীর কবি গোবর্ধন আচার্যের সংস্কৃত কাব্য 'আর্যাসপ্তশতী'তে পাওয়া যায়।

এই মিশ্রণের পথ আরও প্রশস্ত হল মুসলিম অভিযানের ফলে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন মঙ্গল দেবদেবীর মহিমা বিষয়ক কাব্যগুলি এই মুসলিম আক্রমণের ফলেই অঙ্কুরিত হয়। এই আক্রমণে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য জীবন ও লৌকিক জীবন সমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। সমাজের নেতৃত্ব থেকে অপসারিত বর্ণহিন্দুরা সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের অবতলবর্তী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ধর্ম বাঁচাতে ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তাঁদের পূজিত দেবদেবীদের সঙ্গে নিজেদের দেবদেবীর সমন্বয় ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে তৎপর হলেন। এভাবেই মঙ্গলকাব্যের মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রমুখ লৌকিক দেবতা উচ্চ হিন্দুস্তরে সম্মানের আসন লাভ করলেন।

মুসলিম বিজয়ের ফলে নানাভাবে সংস্কৃতির সমন্বয় ক্রমশ নিবিড় হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতানগণ এদেশের ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ থেকে রাজসভায় কবি-পণ্ডিতদের আহ্বান জানালেন। সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত পণ্ডিতেরা রাজ-নির্দেশে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলা ভাষায় কাব্যাকারে অনুবাদ করলেন। এযাবৎকাল সংস্কৃত পাঠে যাদের অধিকার ছিল না, তারাও অনূদিত কাব্যপাঠের অধিকারী হয়ে উঠলেন। এইভাবেই বাংলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের গোড়াপত্তন হল এবং তাতে এসে মিশল পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে জনশ্রুতিমূলক লৌকিক আখ্যান, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-বিশ্বাসের সঙ্গে সমন্বিত হল লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস। আর এইভাবে সুলতানদের মধ্যস্থতায় বাংলার দুটি বিচ্ছিন্ন, আলাদা সংস্কৃতিধারা যেন একত্রিত হল। এই ভাব-সমন্বয়ের লক্ষণ যে কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দু ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়—হিন্দু-মুসলমান মিলনের ভিত্তিও এভাবে রচিত হয়েছে। মুসলিম সুলতানেরা হিন্দু কবিদের যেমন 'খান' উপাধিতে ভূষিত করেছেন (যশোরাজ খান, গুণরাজ খান); আবার হিন্দু কবিরাও সুলতানদের 'শ্রীযুক্ত' করে তুলেছেন ('শ্রীযুত হুসেন জগত ভূষণ')। সংস্কৃতির সমন্বয়ের দিক থেকে এসকল ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ কাব্য-শাখা সুলতানদেরই প্রেরণাসঞ্জাত। পরবর্তীকালে পির-ফকিরদের দ্বারা সুফিমত ও হিন্দুমতের যে মিলন ঘটেছিল, তারও মূলে ছিল সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলিম আমলেই মিথিলার সঙ্গে বাংলার যোগ নতুন করে স্থাপিত হয়েছে। মুসলিম লস্করদের মাধ্যমে আরাকানের সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতিগত যোগসূত্র হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে যেসব কাব্য-কবিতা রচিত হয়েছে, সেগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এক---বৈষ্ণব গীতিকবিতা, দুই---কাহিনি সমন্বিত পাঁচালি কাব্য। পাঁচালি কাহিনিগুলির একভাগ

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণাদির অনুবাদ। অন্যভাগ, লৌকিক দেবদেবীর মহিমাজ্ঞাপক 'মঙ্গল-গীতি'। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে স্পষ্টত তিনটি শাখায় ভাগ করা যেতে পারে— (১) গীতিকবিতা বা পদাবলি, (২) অনুবাদ শাখা এবং (৩) মঙ্গলকাব্য শাখা।

এই সাহিত্যের সম্পূর্ণ আয়োজন কেবল ধর্মকে কেন্দ্র করে। অথচ তুর্কি অভিযানের আগে এদেশেই সংস্কৃত রসসাহিত্যের বিচিত্র কাব্যশাখার অনুশীলন হয়েছে—নাটক রচিত হয়েছে, মহাকাব্য রচিত হয়েছে, প্রেমাশ্রিত খণ্ডকাব্য রচিত হয়েছে। সেসব সাহিত্য ধর্ম-বহির্ভূত জীবনের স্বাদে পূর্ণ। অথচ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় যে কাব্যরচনার ধারা প্রবর্তিত হল, তাতে ধর্মই মুখ্য। ইংরেজ-অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত সাহিত্যের জগৎ এমনই ধর্মাশ্রিত থেকেছে। এই প্রথাবদ্ধ, সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সাহিত্যে কোনো নতুনত্ব ছিল না। কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র, ভাষা, ছন্দ পর্যন্ত বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে রকমের ক্লান্তিকর, ক্লিশে হয়ে পড়েছিল। তবে এরই মধ্যে কোনো কোনো কবি নিজেদের মৌলিকতা প্রকাশ করেছেন, যার মাধ্যমে বাঙালির গীতিপ্রবণতা, গল্প শোনার আগ্রহ পরিতৃপ্ত হয়েছে। ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেও কাব্যসাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির কথা, জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, সমাজের নিয়ম-নীতির কথা, এসেছে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা—প্রবাদ প্রবচন, লোকশ্রুতি, ধাঁধা-প্রহেলিকা, রঙ্গ-রসিকতা। সমগ্র বাঙালি জীবনই প্রতিফলিত হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে।

তুর্কি আক্রমণ—সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিণাম :

আনুমানিক ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইফ্‌তিকারউদ্দীন বিন বখ্‌তিয়ার খিলজি বাংলাদেশের শাসক লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে নবদ্বীপ জয় করেন। সেনবংশকে গৌড়দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে খিলজি একে একে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গও অধিকার করেন। এভাবেই বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হল। ধ্বংস হল মন্দির, বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় নিদর্শন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি। চলল ব্যাপক হত্যা, ধর্মান্তরিকরণ। সমাজে তখন চরম নিরাপত্তাহীনতা। সমাজজীবনে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ভেদাভেদ কমে এল। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গেল। সাংস্কৃতির প্রতিরোধ গড়ে উঠতে লাগল। অখণ্ড বাঙালিত্বের ধারণার বীজ বপিত হল। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তাঁর সুশাসনে আর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে পুনরুজ্জীবন লক্ষ করা যায়। ক্রমশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর্য-অনার্যের সমন্বয়, পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে লৌকিক কাহিনির সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যধারার বঙ্গানুবাদ শুরু হয়। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি রচনা শুরু হয়। বাইরের শক্তির আঘাতে বাঙালির জাতীয় জীবন তার নানা অসঙ্গতি, ভাঙন, ভেদাভেদ ভুলে সংহত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন :

শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘর থেকে বাংলায় লেখা রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক প্রথম আখ্যানকাব্যটির পুথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে কাব্যটি তাঁরই সম্পাদনায় মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যের প্রাপ্ত পুথিটিতে প্রথম ও শেষদিকের কিছু পৃষ্ঠা না পাওয়ার কারণে গ্রন্থনাম,

রচয়িতা বা রচনাকাল সম্পর্কে জরুরি কিছু তথ্য অজানা থেকে যায়। বস্তুত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি কাব্যের বিষয়বস্তু বিচার করে সম্পাদকেরই দেওয়া। প্রাপ্ত পুথির ভিতরে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামে একটি গ্রন্থের চিরকুট থাকায় কেউ কেউ মনে করেন পুথিটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায়, সম্পাদক প্রদত্ত নামেই এর পরিচিতি। মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত হয়ে থাকতে পারে বলে গবেষকেরা অনুমান করেন। সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ কবি বড়ু চণ্ডীদাস/অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস/চণ্ডীদাস ভাগবতাদি পুরাণ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে যেমন অকুণ্ঠ সাহায্য নিয়েছেন, তেমনি লোকজীবন-নির্ভর প্রচলিত কাহিনিরও সহায়তা নিয়েছেন। রাধা চরিত্রটির পরিকল্পনাতেও তিনি তাঁর দক্ষতার অনুপম সাক্ষ্য রেখেছেন। কাব্যে রাধা তাঁর পৌরাণিক পরিচয় তুলে ধরে বারংবার কৃষ্ণপ্রেম প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরিশেষে আত্মসমর্পণ ও বিরাগের বিলুপ্তি, যথার্থ কৃষ্ণপ্রিয়া হয়ে ওঠা—এই সমগ্র বিষয়টিকে কবি সংলাপধর্মী নাটক, আখ্যানকাব্য ও গীতিকবিতার মিশেলে অপূর্ব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলির রাধা চরিত্রের পূর্বাভাস তাঁর অঙ্কিত রাধা চরিত্রে লক্ষ করা যায়। সমগ্র কাব্যটি— জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, কালীয়দমন, যমুনা, হার, বাণ, বংশী ও রাধাবিরহ— এই তেরোটি খণ্ডে বিন্যস্ত। কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা প্রবাস পর্যন্ত কাহিনিধারা কাব্যটিতে বিধৃত হয়েছে। কাব্যের মূল চরিত্র তিনটি—কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই। কাব্যটি মূলত উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। এছাড়া কাব্যে প্রচুর রাগরাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অলংকারশাস্ত্রানুসারী উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি অলংকার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত মেলে। বিভিন্ন গ্রামীণ সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতিরও পরিচয় কাব্যটিতে পাওয়া যায়।

অনুবাদ কাব্যধারা—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য :

সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যকে ক্লাসিক মহিমা এনে দিয়েছে। গুপ্তযুগ থেকেই বাংলাদেশের সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, পৌরাণিক সংস্কার সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে দৃঢ়মূল হয়েছে। বৌদ্ধ পালরাজাদের মধ্যে আর্যশাস্ত্র-সংহিতা, পুরাণ-মহাকাব্যের প্রতি আনুকূল্য লক্ষ করা যায়।

বাংলায় ইসলামি শাসন কায়েম হলে অনেক পাঠান সুলতান হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের থেকে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের গল্প শুনতে আগ্রহী হন, অনুবাদ রচনায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন- রুক্নুদ্দিন বারবক্ শাহ্ মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার জন্য 'গুণরাজখান' উপাধি দেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ তাঁদের হিন্দু সভাকবিদের দিয়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়ে দেন। সাহিত্য-অনুবাদের এই ধারার মাধ্যমে সমাজে অসাম্প্রদায়িক ঔদার্যের ছবিই ফুটে ওঠে এবং তা সমাজ-সংস্কৃতির পুনর্গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

বাংলা ভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদক **কৃত্তিবাস ওঝা**। আনুমানিক ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়ায় তাঁর জন্ম হয়। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' হিসেবে প্রচলিত, জনপ্রিয় গ্রন্থটি শ্রীরামপুরের খ্রিস্টীয় যাজকেরা প্রথম মুদ্রিত করেন (১৮০২-০৩)। পরে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় সংস্করণে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন (১৮৩০-৩৪)। তিনি সম্ভবত রাজা দনুজমর্দন কংস গণেশের (গৌড়) সভা অথবা তাহিরপুরের রাজা

কংস নারায়ণের সভা অলংকৃত করতেন। কৃত্তিবাস মূল রামায়ণের অনুবাদকালে তাকে 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে রচনা করেছেন এবং কাব্যকায়াকে আধুনিক করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীরাম পাঁচালি'। বহু শতাব্দীব্যাপী আপামর জনসাধারণের মধ্যে তাঁর কাব্যের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ রামায়ণের মূল চরিত্রগুলির মধ্যে বাঙালি স্বভাবের প্রক্ষেপণ, কাব্যে প্রতিফলিত বাংলার পরিবেশ ও প্রাত্যহিক জীবনচিত্র, ভক্তি ও করুণরসের সর্বজনগ্রাহ্যতা এবং সাধারণ মানুষের মননে সহায়ক পাঁচালির ঢঙ। গবেষকদের অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কবি তাঁর এই কাব্য রচনা করেছিলেন।

রামায়ণের অনুবাদের ধারা

- *পঞ্চদশ শতাব্দী :*

  কৃত্তিবাস ওঝা—শ্রীরাম পাঁচালি।

  মাধব কন্দলি —শ্রীরাম পাঁচালি।

- *ষোড়শ শতাব্দী :*

  শঙ্কর দেব—শ্রীরাম পাঁচালি (উত্তর কাণ্ড)।

- *সপ্তদশ শতাব্দী :*

  নিত্যানন্দ আচার্য—'অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ।

  রামশঙ্কর দত্ত—রাম কথা।

  'দ্বিজ' অথবা পতিত ভবানীনাথ—লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়।

  দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণ—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

  চন্দ্রাবতী—রামায়ণ।

- *অষ্টাদশ শতাব্দী :*

  ফকির রাম 'কবিভূষণ'—অঙ্গদ রায়বার।

  রামচন্দ্র—বিভীষণের রায়বার।

  রামনারায়ণ—বিভীষণের রায়বার।

  কাশীরাম—কালনেমির রায়বার।

  দ্বিজ তুলসী—অঙ্গদ রায়বার।

  খোশাল শর্মা—অঙ্গদ রায়বার।

  জগন্নাথ দাস—লঙ্কাকাণ্ড।

  দ্বিজ দয়ারাম—তরনীসেনের যুদ্ধ।

  কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

  দ্বিজ শিবরাম—লক্ষ্মণ শক্তিশেল।

  উৎসবানন্দ—সীতার বনবাস।

  জগৎরাম রায়—অদ্ভুত রামায়ণ।

কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর রামায়ণের অনুবাদে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অনেকাংশেই বাল্মীকির প্রদর্শিত পথে না গিয়ে নিজ কল্পনা অনুসারে চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বীরত্বের গরিমা প্রচার নয়, রাম চরিত্রের মাধুর্য বর্ণনাই তাঁর অন্বিষ্ট। তাঁর কাব্যের মূল সুর ভক্তি। বাঙালি হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনাদর্শ, কল্পনা, সমাজ-ভাবনা, জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাঙালির নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মজীবনে তাঁর কাব্যের বিপুল প্রভাব লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে বহু কবির প্রক্ষেপ, লিপিকরদের হাতে পরিবর্তন তাঁর কাব্যের রূপটিকে যেমন বদলে দিয়েছে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও রামায়ণের অনুবাদে ব্যাপক বদল ঘটিয়েছে।

চৈতন্যোত্তর যুগের রামায়ণের মধ্যে 'অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ' উল্লেখযোগ্য। পাবনা জেলার অমৃতকুণ্ডা গ্রামে ১৭শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি নিত্যানন্দ আচার্যের এই রচনা উত্তরবঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কবি 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' 'রঘুবংশম্' থেকে তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ইনি ছাড়া আর যাঁরা বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— কৈলাস বসু, দ্বিজ ভবানীদাস, দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণ চক্রবর্তী, কবিচন্দ্র প্রমুখ।

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। কৃত্তিবাস ওঝা স্বয়ং লিখেছেন— 'লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত'। রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অগণিত কবি মহাভারত রচনাতেও আত্মনিয়োগ করেন। কেউ কোনো বিশেষ পর্ব বা উপাখ্যান নিয়ে, কেউ বা সমগ্র মহাভারত কাব্যের অনুবাদ করেন। খ্রিস্টীয় আনুমানিক ষোড়শ শতকে বাংলায় মহাভারত রচনা শুরু হয়। বাংলায় সংস্কৃত মহাভারতের প্রথম কবি সম্ভবত পরমেশ্বর দাস, যিনি তাঁর কাব্যে 'কবীন্দ্র' উপাধি ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাব্যের নাম 'পাণ্ডববিজয় পাঞ্চালিকা'। বাংলার শাসনকর্তা হুসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁরই এক সেনাপতি, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের আদেশে রচিত আঠারো পর্বে সমাপ্ত এই কাব্যটিকে 'পরাগলী মহাভারত' ও বলা হয়।

পরাগল খানের পর তাঁর পুত্র নসরৎ খান, যিনি ছুটি খান বা ছোটে খাঁ নামেই পরিচিত ছিলেন, চট্টগ্রামের শাসক হন। মহাভারত-কাহিনির প্রতি অনুরক্ত হয়ে তিনি তাঁর সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বিস্তৃত অনুবাদ করান, যার কাহিনি কবি প্রকৃতপক্ষে জৈমিনী সংহিতা থেকে গ্রহণ করেছেন।

মহাভারত অনুবাদের ধারা

ষোড়শ শতাব্দী

'কবীন্দ্র' পরমেশ্বর দাস—পাণ্ডব বিজয়

শ্রীকর নন্দী—অশ্বমেধ কথা

রামচন্দ্র খান—অশ্বমেধ পর্ব

দ্বিজ রঘুনাথ—অশ্বমেধ পাঁচালি

অনিরুদ্ধ—ভারত পয়ার

রুদ্রদেব—আদিপর্ব

দ্বিজ বলরাম—বন পর্ব

বৈদ্য পঞ্চানন—কর্ণ পর্ব

রামনন্দন—শল্য পর্ব

দ্বিজ বৈদ্যনাথ—শান্তি পর্ব

সপ্তদশ শতাব্দী

কাশীরাম দাস—মহাভারত

নিত্যানন্দ ঘোষ—মহাভারত

কৃষ্ণানন্দ বসু—শান্তিপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

রামনারায়ণ দত্ত—দ্রোণ পর্ব

দ্বিজ হরিদাস—অশ্বমেধ পর্ব

ঘনশ্যাম দাস—অশ্বমেধ পর্ব

'সঞ্জয়'—মহাভারত

অষ্টাদশ শতাব্দী

দুর্লভ সিংহ—ভারত পাঁচালি

গোপীনাথ পাঠক—সভা পর্ব

সুবুদ্ধি রায়—অশ্বমেধ পর্ব

পুরুষোত্তম দাস—পাণ্ডব পাঁচালি

দ্বিজ রামলোচন—শ্রী পর্ব

দ্বৈপায়ন দাস—ভারত পাঁচালি

ষোড়শ শতকে রামচন্দ্র খান নামে এক ভক্ত বৈষ্ণব কবিও জৈমিনী সংহিতা অবলম্বনে অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। এছাড়া এই শতকে পীতাম্বর দাস মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনি নিয়ে একটি পাঁচালি কাব্য রচনা করেন। কবি দ্বিজ রঘুনাথ 'অশ্বমেধ পাঁচালী' রচনা করেন। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজের প্রেরণায় কবি অনিরুদ্ধ 'ভারত-পাঁচালী' রচনা করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মহাভারতের মধ্যে নন্দরাম দাসের উদ্যোগ ও দ্রোণপর্ব, বিশারদ ভণিতাযুক্ত বন ও বিরাটপর্ব, নিত্যানন্দ ঘোষের 'ভারত-পাঁচালী', অনন্ত মিশ্রের 'অশ্বমেধ পর্ব', দ্বিজ হরিদাসের 'অশ্বমেধ পর্ব', দ্বিজ হরিদাসের 'অশ্বমেধ পর্ব', রামেশ্বর নন্দীর 'মহাভারতের আদিপর্ব'; শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত 'ভারত- পাঁচালী' উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত উল্লেখযোগ্য মহাভারত কাহিনির মধ্যে রয়েছে রাজীব সেনের 'উদ্যোগ পর্ব', দ্বিজ ঘনশ্যামের 'অশ্বমেধ পর্ব', দ্বিজ কৃষ্ণরাম, প্রেমানন্দের ভণিতায় 'অশ্বমেধ পর্ব', রাজেন্দ্রদাসের 'মহাভারত, আদিপর্ব' ইত্যাদি। কবিচন্দ্র, ষষ্ঠীবর সেন এবং গঙ্গাদাস সেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেন।

বাংলা ভাষায় মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক **কাশীরাম দাস** আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। পিতা কমলাকান্ত দাস। বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলের সিঙ্গিগ্রাম অথবা দাইহাটের নিকটবর্তী সিঙ্গিগ্রাম অঞ্চলে সম্ভবত তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল। তিনি মহাভারতের কটি পর্ব অনুবাদ করেছিলেন, তা ঠিক জানা না গেলেও, তাঁর মহাভারতের প্রথম চার পর্ব (১৮০১-০৩) শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রেস থেকেই সম্পূর্ণ অংশ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্রণ, প্রকাশ ও প্রচার এর জনপ্রিয়তার সহায়ক হয়েছিল। মধুর শব্দ, অলঙ্কার, উপমা, ছন্দ ব্যবহারে নিপুণ কবি কাশীরাম দাস পুরাণ কাহিনি, পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব এবং বাঙালি চরিত্র ও সংস্কৃতির নিবিড় জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। মেদিনীপুরের আবাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থেকে শিক্ষকতা জীবন অতিবাহিত করার সুবাদে রাজবাড়িতে আসা পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত ও কথকদের মুখে মহাভারত কথা শুনে তিনি তা অনুবাদে উৎসুক হয়ে পড়েন। সমগ্র কাব্যটি তাঁর নামে চললেও আদি, সভা, বন পর্বের পর বিরাট পর্বে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই তিনি লোকান্তরিত হন। ভারত পাঁচালি কাব্যের কবিরূপেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর নামে রচিত 'সত্যনারায়ণের পুঁথি', 'স্বপ্নপর্ব', 'জলপর্ব' ও 'নীলোপাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর কাব্যটি রচিত হয়েছিল। মূল মহাভারতের ভাবানুবাদ করতে গিয়ে কবি বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে নিজের কল্পনাকেও যুক্ত করেছেন। তিনি নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসের জাল বুনে কাব্যের চরিত্রগুলির উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনারীতি সরল, সহজ, প্রাঞ্জল, রসপ্রদীপ্ত। চরিত্রচিত্রণে বাঙালিয়ানার পরিচয়ে কবি যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। বাঙালির সামাজিক, পারিবারিক আদর্শ, ধর্মবোধ, নৈতিকতা—এসবই ছিল তাঁর কাব্যের রসদ। তাই বাঙালির কাছে তাঁর কাব্যের চিরকালীন সমাদর।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ' সাধারণভাবে 'ভাগবত' নামে পরিচিত। বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম এবং তাঁর ব্রহ্মসূত্রের বারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত অকৃত্রিম ভাষ্য হল 'ভাগবত'। এর বিষয়বস্তু হল শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা। বাংলায় ভাগবতচর্চার শুরু চৈতন্য-পূর্ব যুগে হলেও এর বিস্তার ঘটেছে চৈতন্য পরবর্তী যুগে। সংস্কৃত ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে বাংলায় প্রথম কাব্য রচনা করেন বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বসু বা গুণরাজ খান। তিনি চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কাব্যটি ১৪৭৩-১৪৮০

খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দ অবলম্বনে কবি তাঁর কাব্যটি রচনা করেছেন এবং তত্ত্বগত জটিলতার পরিবর্তে কাহিনির প্রতি বেশি আলোকপাত করেছেন।

শ্রীচৈতন্য যে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' (২।১৫)। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের নাম-উল্লেখ পাওয়া যায়। এটিই সন-তারিখযুক্ত প্রথম বাংলা কাব্য। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, বৈষ্ণবীয় তন্ত্র গ্রন্থের অনুসরণে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কবিত্বের সঙ্গে ভক্তিপ্রাণতার মিশেল ও ঐশ্বর্যভাবের সঙ্গে মধুর কান্তাভাবের সমন্বয় শ্রী চৈতন্যও আস্বাদন করেন। রাধাভাবের উন্মেষ তাঁর কাব্যেই প্রথম লক্ষ করা যায়, যা বৈষ্ণব পদাবলির পূর্বাভাসকে সূচিত করেছে। কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের চেয়ে মধুর ও কান্তা ভাবটিই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। অনূদিত গ্রন্থ হলেও প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি আপন কবিত্বশক্তিকে উজাড় করে দিয়েছেন।

ভাগবত অনুবাদের ধারা

● *পঞ্চদশ শতাব্দী* : মালাধর বসু—শ্রীকৃষ্ণবিজয়। যশোরাজ খান—কৃষ্ণমঙ্গল। ● *ষোড়শ শতাব্দী* : গোবিন্দ আচার্য—কৃষ্ণমঙ্গল। পরমানন্দ গুপ্ত—কৃষ্ণলীলা। রঘুপণ্ডিত—কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী। দ্বিজ মাধব—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। 'দুঃখী' শ্যামাদাস—গোবিন্দমঙ্গল। কবিশেখর—গোপালবিজয়। কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। ● *সপ্তদশ শতাব্দী* : শ্রীকৃষ্ণকিংকর—শ্রীকৃষ্ণবিলাস। যশশ্চন্দ্র—গোবিন্দবিলাস। ভবানন্দ—হরিবংশ। ● *অষ্টাদশ শতাব্দী* : অভিরাম দাস—কৃষ্ণমঙ্গল। বলরাম দাস—কৃষ্ণলীলামৃত। দ্বিজ রমানাথ—শ্রীকৃষ্ণবিজয়। শঙ্কর চক্রবর্তী—গোবিন্দমঙ্গল। দ্বিজ মাধবেন্দ্র—ভাগবতসার। ঘনশ্যাম দাস—শ্রীকৃষ্ণবিলাস। দ্বিজ রামেশ্বর—গোবিন্দমঙ্গল। দ্বিজ প্রভুরাম—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। নন্দরাম ঘোষ—শ্রীকৃষ্ণবিজয়। দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ—কৃষ্ণমঙ্গল। ভক্তরাম দাস—গোকুলমঙ্গল। পরাণ দাস—রসমাধুরী।

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য ধারা : শ্রীমদ্ভাগবতের ভাব উৎসারিত আরেকটি বিশিষ্ট কাব্যশাখা হলো 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। পঞ্চদশ শতকে মালাধর বসুর কাব্য রচিত হওয়ার পর ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চলে এই ধারা।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগে শাক্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করে এক শ্রেণির আখ্যায়িকা কাব্য লিখিত হয়েছিল, যেগুলি 'মঙ্গল গান' নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন ধর্ম ও উপধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব-প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কবিরা দেবতার যে প্রশস্তিগান রচনা করেছেন সেগুলিই কালক্রমে 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত হয়। 'মঙ্গল' শব্দটি মাহাত্ম্য প্রচারমূলক যে কোনো রচনা বোঝাতে ব্যবহৃত হত, তা সে চরিতসাহিত্যের ক্ষেত্রে, পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদের ক্ষেত্রে, এমনকি তীর্থ মাহাত্ম্যসূচক রচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলগান রচিত হয়ে আসলেও ব্যাপক প্রচারের কারণে সেই সময়ের ভাষাছাঁদ পরবর্তীকালে লিপিকরদের হাতে অনেকটাই আর মূলানুগ থাকেনি।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে সমন্বয় লক্ষ করা গেছে, মঙ্গলকাব্যে কোনো একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে, তারই পরিচয় মেলে। এই গানগুলি দেবদেবীর পূজা বা উৎসব উপলক্ষ্যে পরপর কয়েকদিন ধরে একটানা সুর-তাল সহযোগে গাওয়া হত। মানুষ বিশ্বাস করত এ গান শুনলে মঙ্গল হয়। এক মঙ্গলবার থেকে পরের মঙ্গলবার পর্যন্ত গানগুলি গীত হবার রেওয়াজ ছিল। বাংলার সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস গানগুলিতে বিধৃত রয়েছে। কখনো লৌকিক, কখনো বা পৌরাণিক দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের কাহিনিতে মানুষও উপেক্ষিত থাকেনি।

ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত অনুসারী কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য

যশোরাজ খান---কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দ আচার্য---কৃষ্ণমঙগল, পরমানন্দ গুপ্ত---কৃষ্ণস্তবাবলী রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য---শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙিগনী, দ্বিজ মাধব আচার্য---কৃষ্ণমঙগল, কবিশেখর রায়---গোপালবিজয়, দুঃখী শ্যামদাস—গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ভবানন্দ—হরিবংশ, পরশুরাম চক্রবর্তী—কৃষ্ণমঙ্গল, ঘনশ্যাম---হরিবংশ/ব্রহ্মবৈবর্ত, ভাগবৎ কৃষ্ণকীর্তন, যশশ্চন্দ্র---গোবিন্দবিলাস, ঘনশ্যাম দাস---শ্রীকৃষ্ণবিলাস, বলরাম দাস---কৃষ্ণলীলামৃত, দ্বিজ রমানাথ---শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র---গোবিন্দমঙগল/ভাগবতামৃত, দ্বিজ মাধবেন্দ্র—ভাগবতাসার, দ্বিজ রামেশ্বর—গোবিন্দমঙ্গল, দ্বিজ প্রভুরাম—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

সপ্তদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

সনাতন বিদ্যাবাগীশ—ভাষাভাগবত, কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণমঙ্গল, কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ঘনশ্যামদাস—কৃষ্ণবিলাস, দ্বিজ ঘনশ্যাম—হরিবংশ, বংশীদাস—কৃষ্ণকেলিচরিতামৃত, অভিরাম দাস—গোবিন্দবিজয়, পরশুরাম চক্রবর্তী—কৃষ্ণমঙ্গল, যশশ্চন্দ্র—গোবিন্দবিলাস, পরশুরাম রায়—মাধব সঙ্গীত, ভবানন্দ—হরিবংশ, ভবানী দাস (ঘোষ)—রাধাকৃষ্ণবিলাস, নরহরি দাস—কেশবমঙ্গল, দ্বিজ নরহরি দাস—উদ্ধব সংবাদ, দ্বিজ গোবিন্দ—অক্রুর আগমন পালা, কবি বল্লভ—রসকদম্ব, যদুনন্দন দাস—কর্ণামৃত, গুরুচরণ দাস—প্রেমামৃত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী—ভাগবতামৃত গোবিন্দমঙ্গল, মহারাজা গোপাল সিংহ—রাধাকৃষ্ণমঙ্গল, দীন বলরাম দাস—কৃষ্ণলীলামৃত দ্বিজ রমানাথ—শ্রীকৃষ্ণবিজয়, দ্বিজ রামেশ্বর—গোবিন্দ বিজয়, রামেশ্বর দাস—শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, বনমালী দাস—গোবিন্দমঙ্গল, ভক্তরাম দাস—গোকুলমঙ্গল, নন্দরাম ঘোষ—তালভক্ষণ, দ্বিজ বৃন্দাবন—শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, পরাণ দাস—রসমাধুরী, কৃষ্ণরাম দত্ত—রাধিকামঙ্গল, দ্বিজ চণ্ডী—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রসিক শেখর—পারিজাতহরণ, উদ্ধবানন্দ—রাধিকামঙ্গল, দীন হরিদাস—মুকুন্দ মঙগল, রামপ্রসাদ রায়---কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু, দীননাথ---শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, জয়ানন্দ দাস---কৃষ্ণের জন্ম, দ্বিজ জয়নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণবিলাস, বাণীকণ্ঠ দ্বিজ—কৃষ্ণমঙ্গল, দামোদর দাস—কৃষ্ণমঙ্গল, রামকৃষ্ণ দিবজ—গোবিন্দমঙ্গল, দ্বিজ কবিরত্ন---শ্রীকৃষ্ণমঙগল, হরিবোল দাস---নৌকাখণ্ড, চন্দ্রশেখর---অক্রুরাগমন, হরিকৃষ্ণ দাস---অক্রুরাগমন, দ্বিজ সন্তোষ—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, বিশ্বনাথ ভট্টরায়—শ্রীকৃষ্ণলীলা। এছাড়া নন্দদুলাল দাসের নামে একটি পুথি পাওয়া যায়; অক্রুরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনোদ্যোগ পর্যন্ত কাহিনি বর্ণনার পর পুথিটি খণ্ডিত।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই মঙ্গলকাব্যগুলি রচনারীতি ও বিষয়বস্তুর পরিকল্পনার দিক থেকে নতুনত্ব হারিয়ে বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের নায়কই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু, কোনো বিশেষ দেবতার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মানবজন্ম লাভ করে। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের সূচনায় গণেশ প্রমুখ পঞ্চদেবতার বন্দনা, এরপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণন, সৃষ্টিরহস্য কথন বাঁধাধরা রীতিতে পরিণত হয়। এছাড়া শিব প্রসঙ্গ (ধর্মমঙ্গলে শুধুমাত্র ‘শিব’ প্রসঙ্গের পরিবর্তে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান), নায়িকার সারা বছরের দুঃখের কথা (বারমাস্যা) বর্ণনা, নারীদের পতিনিন্দা প্রসঙ্গ, চৌতিশা/বর্ণানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার স্তব, পাক-প্রণালীর/রন্ধনকার্যের বিস্তৃত বর্ণনা, বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তির বর্ণনা, সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা, সদাগরদের উপকূল বাণিজ্যের প্রসঙ্গ, জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গ, প্রহেলিকা বা ধাঁধার উল্লেখ, যুদ্ধ বর্ণনা, দেবীর জরতী/বৃদ্ধার বেশ ধারণ করে নায়ক-নায়িকাকে ছলনা/রক্ষা করা প্রসঙ্গ, মশান বা শ্মশান বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনা, সাজ-সজ্জার বর্ণনা, নগরবর্ণনা, দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে দেবতার পদতলে নতশীর্ষ করানো প্রসঙ্গ, দৈবকার্যে হনুমান ও বিশ্বকর্মার অবতারণা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, নানান কুসংস্কার, ভক্ষ্য, ভোজ্য, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই অনিবার্যভাবে এসেছে।

মঙ্গল গানগুলির মধ্যে সর্পদেবী মনসার মহিমা ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত মনসা-মঙ্গল কাব্যধারাই প্রাচীনতম বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ব যুগের মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে এই কাব্যধারার প্রাচীনতম কবি হরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই এবং নারায়ণ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচলন যেমন প্রাচীন, তেমনই ব্যাপক। শতাধিক কবি চাঁদ সদাগর-বেহুলা-মনসার কাহিনি নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। এর সঙ্গে হরিবংশ ও ঊষা-অনিরুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনি যুক্ত হয়েছে। চৈতন্য পরবর্তী যুগের মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস, জীবন মৈত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্যের নাম কোথাও 'পদ্মপুরাণ', কোথাও 'মনসার ভাসান' আবার কোথাও 'মনসার জাগরণ'। বাঙালির অনমনীয় পুরুষকার যে দৈবশক্তিকে প্রতিহত করতে পারে, তার আশ্চর্য কাহিনি মনসামঙ্গল কাব্যে স্থান পেয়েছে। মনসামঙ্গলের কবিদের রচনায় সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, লৌকিক সাহিত্যের বর্ণনার বিশিষ্টতা, হাস্যরস, ভৌগোলিক জ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যধারা

হরিদত্ত—কালিকাপুরাণ, নারায়ণ দেব—পদ্মাপুরাণ, আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দী, বিজয়গুপ্ত—পদ্মাপুরাণ—পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী, বিপ্রদাস—মনসামঙ্গল—পঞ্চদশ শতাব্দী, গঙ্গাদাস সেন—মনসামঙ্গল—ষোড়শ শতাব্দী, দ্বিজ বংশীদাস—পদ্মাপুরাণ—ষোড়শ শতাব্দী, কালিদাস—মনসামঙ্গল—সপ্তদশ শতাব্দী, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—মনসামঙ্গল—সপ্তদশ শতাব্দী, তন্ত্রবিভূতি—মনসামঙ্গল—সপ্তদশ শতাব্দী, জগজ্জীবন ঘোষাল—মনসামঙ্গল—সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতাব্দী (আনু.), ষষ্ঠীবর দত্ত—পদ্মাপুরাণ—অজ্ঞাত রামজীবন—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, জীবন মৈত্র—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, দ্বিজ রসিক—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, বিষ্ণু পাল—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, বাণেশ্বর রায়—মনসামঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী।

মনসা মঙ্গলের পরেই চণ্ডীমঙ্গলের কথা উল্লেখযোগ্য। দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক এই কাব্যধারার আদি কবি মানিক দত্ত খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। **কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী** লিখেছেন—'মানিক দত্তেরে আমি করিলুঁ এ বিনয়/যাহা হৈতে হৈল গীত পথ-পরিচয়'। অনুমিত হয় যে, তিনি মালদহ অঞ্চলের কবি। তাঁরই রচনাধারা অনুসরণ করে এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মপ্রকাশ। তাঁর আদি বসতি ছিল বর্ধমান জেলার রায়না থানার অধীন দামুন্যা গ্রামে। পিতা হৃদয় মিশ্র, মা দৈবকী। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে আসেন এবং সেখানকার ভূস্বামীর আশ্রয়ে থেকে স্বপ্নাদিষ্ট কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, মানসিংহ যখন বাংলার সুবেদার, তখন তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যকে তিনি 'অভয়া-মঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল', 'অম্বিকামঙ্গল' প্রভৃতি নামে পরিচায়িত করেছেন। তাঁর রচনায় বাস্তবনির্ভর কাহিনিবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, কৌতুকরস সৃষ্টির নৈপুণ্য লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যে সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিক গুণ লক্ষ করা যায়। কাব্যধারার পূর্বতন কবির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলেও তাঁর আপন প্রতিভার সাক্ষ্য তিনি তাঁর রচনায় রেখেছেন। প্রথাগত, গন্ডিবদ্ধ কাহিনি কলেবরের শৃঙ্খলে তাঁর কবিত্বের স্ফূরণ ক্ষুণ্ণ হয়নি। মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ার ছন্দপ্রয়োগ এবং একপদী, ত্রিপদীর কাঠামো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি রচনায় বৈচিত্র্য এনেছেন। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি অলংকারের প্রয়োগে, প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনকে কাব্যভাষায় সুষ্ঠু ও সাবলীল ব্যবহারে তিনি উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখেন।

চণ্ডীমঙ্গলের আরেকজন কবি দ্বিজমাধব মুকুন্দের পূর্ববর্তী কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অপর নাম মাধবানন্দ। তাঁর গ্রন্থ 'সারদা চরিত' নামে পরিচিত। গ্রন্থটি আনুমানিক ১৫৭৯খ্রি:-১৬৪৪ খ্রি: র মধ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় 'আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস তাঁহার পূর্বে আর খুব বেশি কবি দেখাইতে পারেন নাই।' তাঁর পুথি কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গ, বিশেষত, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম থেকে চলে গিয়ে সম্ভবত তিনি পূর্ববঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর রচনা অনুসরণে চণ্ডীমঙ্গলের একটি নির্দিষ্ট ধারার সৃষ্টি হয়েছিল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা

ষোড়শ শতাব্দী :

মানিক দত্ত—চণ্ডীমঙ্গল,

দ্বিজমাধব—মঙ্গলচণ্ডীর গীত,

মুকুন্দ চক্রবর্তী—কবিকঙ্কণ চণ্ডী,

সপ্তদশ শতাব্দী :

দ্বিজ রামদেব—অভয়ামঙ্গল,

অষ্টাদশ শতাব্দী

মুক্তারাম সেন—সারদামঙ্গল,

হরিরাম—চণ্ডীমঙ্গল

ভারতচন্দ্র রায়—অন্নদামঙ্গল,

জয়নারায়ণ সেন—চণ্ডীমঙ্গল,

ভবানীশঙ্কর—মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা,

আকিঞ্চন চক্রবর্তী—চণ্ডীমঙ্গল

এছাড়াও দ্বিজ বলরাম, দ্বিজ জনার্দন, মুক্তারাম সেন, রামানন্দ যতির লেখা চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালি রচনা এবং মুকুন্দ মিশ্রের বাসুলীমঙ্গল ও রাধাকৃষ্ণ দাসের গোসানীমঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীমঙ্গলে দুটি খণ্ড/কাহিনি লক্ষ করা যায়। আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ড। আখেটিক খণ্ডের নায়ক ব্যাধ কালকেতু, বণিক খণ্ডের নায়ক ধনপতি সদাগর। দুটি কাহিনির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। উভয়খণ্ডেই দেবী চণ্ডীর মহিমা কীর্তিত হলেও তাঁর স্বরূপ এই দুই কাব্য খণ্ডে আলাদা। প্রথম খণ্ডে তিনি পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দ্বিতীয়টিতে হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার দেবতা।

মঙ্গলকাব্যের আরেকটি প্রধান শাখা ধর্মমঙ্গল। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তন করে এই কাব্যধারা গড়ে উঠেছে। আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই ধারার আদি কবি ময়ূরভট্ট বর্তমান ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'হাকন্দ পুরাণ'। তাঁর কাব্যটি পাওয়া না গেলেও ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এই নামেই তাঁর কাব্যের উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, এটি শুধু রাঢ় অঞ্চলেই রচিত হয়েছিল। তখন রাঢ় বলতে বোঝাত পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর এবং পশ্চিমে ছোটোনাগপুর পার্বত্যভূমি-বেষ্টিত ভূ-ভাগকে। অর্থাৎ বর্তমান বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চল। এই অঞ্চলের ধর্মমত, আচার পদ্ধতি, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাস ধর্মমঙ্গল কাব্যে ফুটে উঠেছে। ধর্মকে বুদ্ধ, কচ্ছপ, যম, সূর্য, বিষ্ণু, বরুণ ইত্যাদি নানারূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শুধু ডোম জাতির লোকেদেরই এই দেবতার পূজায় পৌরোহিত্য করার অধিকার রয়েছে। ধর্ম মূলত আদিবাসীদের সূর্যদেবতা। ডোম জাতি প্রাচীন আদিবাসী জাতিসম্ভূত। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ তারা হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে উঠে ধর্মঠাকুরের পূজার অধিকার রক্ষা করে আসছে। মঙ্গলকাব্য রচনার যুগে সর্বস্তরের সমাজের দ্বারা ধর্মঠাকুরের প্রভাবকে স্বীকার করার ফলে উচ্চবর্ণের কবিরাও তাঁর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য রচনা করেছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা

ময়ূরভট্ট---কাব্যনাম ও আবির্ভাবকালে অজ্ঞাত, আদিরূপরাম---কাব্যনাম ও আবির্ভাবকাল অজ্ঞাত, খেলারাম—ধর্মমঙ্গল—ষোড়শ শতাব্দী (আনুমানিক), মানিকরাম গাঙ্গুলী—ধর্মমঙ্গল—ষোড়শ শতাব্দী, রূপরাম—ধর্মমঙ্গল (অনিশ্চিত), শ্যাম পণ্ডিত—ধর্মমঙ্গল (ষোড়শ-সপ্তদশ, আনুমানিক), সীতারাম দাস—অনাদিমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, রাজারাম দাস—ধর্মমঙ্গল—সপ্তদশ শতাব্দী, প্রভুরাম—ধর্মমঙ্গল—অজ্ঞাত, ঘনরাম—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, সহদেব চক্রবর্তী—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, নরসিংহ বসু—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী, হৃদয়রাম সাউ—ধর্মমঙ্গল—অষ্টাদশ শতাব্দী।

এছাড়া গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, রামকান্ত রায়, ধর্মদাস বৈদ্য, বিশ্বনাথ দাস প্রমুখ কবি এই কাব্যধারায় কাব্য রচনা করেছেন।

এছাড়াও, ধর্মমঙ্গল কাব্যের আরেকটি বিশিষ্টতা হল এই যে, এই কাব্যের একটি ক্ষীণ ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালের পুত্রের সঙ্গে অজয় নদের দক্ষিণ তীরবর্তী একটি পার্বত্য গড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষের যুদ্ধবৃত্তান্ত এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। এই গড়ের নাম ঢেকুরগড়, পরে ইছাই ঘোষ যার নাম পরিবর্তন করে রাখেন ত্রিষষ্ঠী গড়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়কের নাম লাউসেন, ইনি গৌড়ের এক সামন্তরাজ কর্ণসেনের পুত্র, তাঁর রাজধানীর নাম ময়নানগর যা বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যগুলির উপর থেকে দেবদেবীর প্রতি ভক্তি দূর হয়ে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এই সময়ে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের বংশগৌরব প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এই সময়ে বর্গির আক্রমণের বৃত্তান্ত অবলম্বন করে কবি গঙ্গারাম তাঁর 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০) হাওড়া জেলার ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের ইনি শ্রেষ্ঠ কবি। সম্পত্তির বিবাদের কারণে তাঁকে স্বগৃহ পরিত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে থাকতে হয়। হুগলি জেলার দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থাকার সময়ে

ইনি ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন। পুরুষোত্তম ধামে বাস করার সময় কিছুদিন সন্ন্যাস জীবনস্থাপন করেন, কিন্তু পরে সংসারী হন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাকবি নিযুক্ত করে কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসেন এবং তাঁরই আদেশে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন ও 'রায়গুণাকর' উপাধি পান। মহারাজের কুলদেবতা অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাব্যই 'অন্নদামঙ্গল'। কাব্যের তিনটি অংশ, প্রথমাংশে হরিহোড়ের কাহিনি, দ্বিতীয়াংশে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি এবং তৃতীয়াংশে মানসিংহের কাহিনি। তিনি তাঁর কাব্যে অন্তর্মুখী ভাব-গভীরতার বদলে বহির্মুখী শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে সমসাময়িক সমাজের রুচির প্রতিফলন সার্থকভাবে ঘটেছে। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—'বিদ্যাসুন্দর', 'রসমঞ্জরী', 'সত্যপীরের কথা', 'নাগাষ্টক' প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবির সম্মান তাঁর প্রাপ্য। ভাষার লালিত্যে, ছন্দ-অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্যে ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায় তিনি বাংলা কাব্যে নতুন সুষমার প্রবর্তক ছিলেন।

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য :

অষ্টাদশ শতকের সৃষ্টি 'কালিকামঙ্গল' কাব্যধারায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেরই অনুকরণ লক্ষ করা যায়। দেবী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক এই কাব্যধারায় বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়জ আকর্ষণের ও পরিণতির কাহিনি রূপলাভ করেছে। আধুনিক সময়ে রচিত হওয়ায় কাব্যে যেমন নাগরিকতার স্পর্শ এসেছে, দেবমহিমাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অন্তরের আবেগধর্ম ছেড়ে কবিরা বাইরের অলংকরণেই যত্নশীল থেকেছেন। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান মূলত উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাহিনি। কাশ্মীরের কবি বিহ্লনের লেখা সংস্কৃত খণ্ডকাব্য 'চৌর-পঞ্চাশিকা'র আদর্শে কাব্যটি রচিত। তবে বিদ্যাসুন্দর কাহিনিতে যে ধর্মীয় প্রসঙ্গ রয়েছে, তা 'চৌর-পঞ্চাশিকা'য় নেই। বাংলায় ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিদ্যাসুন্দর কাহিনি রচনার সূত্রপাত হয়। এই পাঁচালি রচনার প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর। সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণরাম দাস, প্রাণরাম কবিবল্লভ, সাবিরিদ খান এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি কঙ্ক, বলরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রাধাকান্ত মিশ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ বিদ্যাসুন্দর কাহিনি রচনা করেছেন। কবি ভারতচন্দ্র রায় বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গল'। কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—'অন্নপূর্ণা মঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'মানসিংহ'। দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক এই কাহিনিতে সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্নপূর্ণা লৌকিক চণ্ডী, পুরাণবর্ণিত চণ্ডীর প্রভাবে মধ্যযুগের শেষভাগে অন্নদায় পরিণত হয়েছেন এবং নিষ্ঠুর শক্তিদেবী থেকে শুভঙ্করী হয়ে উঠেছেন। দেবীমহিমা বর্ণনার পাশাপাশি কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি বর্ণনা ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রশস্তি রচনা করেছেন। এরই পাশাপশি নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে দেশে বর্গির হাঙ্গামা, বিদেশি বণিকদের চক্রান্ত, সমাজের স্বার্থপরতা, দুর্নীতি প্রভৃতি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা নানা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্রের পর খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে যে কয়েকটি 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচিত হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাধাকান্ত মিশ্রের 'কালিকামঙ্গল', রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' এবং কবীন্দ্র চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গল'।

কালিকামঙ্গল

কঙ্ক — পীরের পাঁচালি (ষোড়শ শতাব্দী), শ্রীধর — বিদ্যাসুন্দর—(ষোড়শ শতাব্দী), শা'বিরিদ খান—কালিকামঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী), গোবিন্দ দাস—কালিকামঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দী), কৃষ্ণরাম দাস—কালিকামঙ্গল (সপ্তদশ শতাব্দী), প্রাণরাম চক্রবর্তী—কালিকামঙ্গল (সপ্তদশ শতাব্দী), বলরাম চক্রবর্তী—কালিকামঙ্গল (সপ্তদশ শতাব্দী), রামপ্রসাদ সেন—বিদ্যাসুন্দর (অষ্টাদশ শতাব্দী), ভারতচন্দ্র রায়—বিদ্যাসুন্দর (অষ্টাদশ শতাব্দী), নিধিরাম আচার্য—কালিকামঙ্গল (অষ্টাদশ শতাব্দী)। এই ধারায় দ্বিজরাজধাকান্ত, কবীন্দ্র প্রমুখ কবিও কাব্য রচনা করেছেন।

বিবিধ দেবদেবী মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য :

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল বাংলার প্রধান মঙ্গলকাব্য। কিন্তু এছাড়াও, বাংলায় আরো অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হয়, যাদের মধ্যে লৌকিক ও স্থানীয়-দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে রচিত মঙ্গলকাব্য যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে বেশ কিছু পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যও। এই ধারার মধ্যে রয়েছে—শীতলামঙ্গল, বাসুলিমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি ব্রতকথা বা পাঁচালি জাতীয় রচনা।

নীচে অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখা ও তাদের প্রধান কবিদের নাম দেওয়া হল :

● শীতলা মঙ্গল—নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, বল্লভ, মানিকরাম গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, শঙ্কর। ● ষষ্ঠীমঙ্গল—কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্ররাম চক্রবর্তী, শঙ্কর। ● রায়মঙ্গল—মাধব আচার্য, কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্রদেব। ● সারদামঙ্গল—দয়ারাম দাস। ● সূর্যমঙ্গল—রামজীবন (আদিত্যচরিত) মালাধর বসু (অষ্টলোকপাল কথা), দ্বিজ কালিদাস (সূর্যের পাঁচালি)। ● গঙ্গামঙ্গল—মাধবাচার্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, জয়রাম, দ্বিজ কমলাকান্ত, দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি, প্রাণবল্লভ, অকিঞ্চন চক্রবর্তী। ● পঞ্চাননমঙ্গল—দ্বিজ রঘুনন্দন। ● সুবচনীমঙ্গল—দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামজীবন, মাধব দাস। ● তীর্থমঙ্গল—বিজয়রাম সেন।

অন্যান্য দেবীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মীমঙ্গল (কবি শিবানন্দ কর) কপিলা-মঙ্গল, বরদামঙ্গল (কবি নন্দকিশোর), কামাখ্যামঙ্গল প্রভৃতি।

শিবায়ন :

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিবের গীত মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সমাজের তথাকথিত নিম্নতম স্তরে আবদ্ধ এই গানগুলি লৌকিক শিবের গৃহস্থালির কাহিনি নিয়ে রচিত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যেও শিব-পার্বতীর সংসার জীবনের কথা রয়েছে। শূন্যপুরাণেও শিব-প্রসঙ্গ রয়েছে। শিবায়নের উদ্দেশ্য শিবমঙ্গল গান, শিবের মহিমা বর্ণনা করা। পৌরাণিক মহিমাবর্জিত শিব এখানে কৃষক রূপে চিত্রিত। তিনি কখনো বা দোষ-গুণে গড়া শাঁখারির ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পুরাণ-বহির্ভূত যেসকল শিব-কাহিনি বহুকাল থেকে এদেশের সমাজে প্রচলিত ছিল, শিবমঙ্গল কাব্যে সেগুলিকেই বিষয় করে তোলা হয়েছে। শিবায়নের হরপার্বতীর পারিবারিক জীবনচিত্রে অভাব অনটন-ক্লিষ্ট দরিদ্র বাঙালির গার্হস্থ্যজীবনই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতক থেকে শিবের কাহিনি মঙ্গলকাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যরূপে রচিত হতে থাকে। প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ শিবমঙ্গল কাব্য সম্ভবত রামকৃষ্ণ রায় রচিত ‘শিব-মঙ্গল’ কাব্য। এছাড়া এই কাব্যধারায় শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ দাস প্রমুখ কবির নাম পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কর্ণগড়ের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত শিবায়ন বা ‘শিব সংকীর্তন’ কাব্যটি শিবমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত কাব্যটিতে শিবকাহিনির পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের অসামান্য মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। আটপালার পাঁচালিকাব্য বা ‘অষ্টমঙ্গলা’ হলেও এতে পদ্মপুরাণ, ভাগবতের আখ্যায়িকার সংমিশ্রণ কবি ঘটিয়েছেন।

বাংলাদেশে মধ্যযুগে শিব-দুর্গাকে অবলম্বন করে কয়েকটি আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল। এগুলির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের প্রচুর মিল লক্ষ করা যায়। শিবায়ন কাব্যগুলিতে পুরাণ ও গ্রাম্যকাহিনির সংমিশ্রণ ঘটলেও পৌরাণিক শিবচরিত্রের মহিমান্বিত রূপ প্রকাশিত হয়নি, কৃষক শিবের ঘর-গৃহস্থালির গল্পই এগুলির উপজীব্য। গ্রামজীবনে কৃষিকাজের দেবতারূপেই এই শিব পূজিত হয়েছেন, যা একান্তভাবে অনার্য শিবসংস্কার প্রসূত। সংস্কৃতে রচিত

নানান শিবপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য থেকে কবিরা তাঁদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন, কাহিনি নির্মাণে পৌরাণিক ও লৌকিক ভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শিবায়নের দু'জন কবি হলেন শঙ্কর কবিচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ রায়। বিষ্ণুপুর নিবাসী শঙ্কর কবিচন্দ্রের শিবায়নের পূর্ণাঙ্গ পুথি পাওয়া না গেলেও 'শঙ্খপরা' ও 'মাছধরা' শীর্ষক দুটি পালা পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর রচনা বাস্তবধর্মী, চিত্তাকর্ষক।

হাওড়া জেলার আমতার কাছে রসপুর গ্রামের রামকৃষ্ণ রায় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর 'শিবমঙ্গল' কাব্যে কবি কাশীখণ্ড, হরিবংশ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারত, স্কন্দপুরাণের সাহায্য নিয়েছেন, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর দ্বারা ও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ কাব্যটি ছাব্বিশটি পালায় বিভক্ত। তাঁর এই কাব্যে লৌকিক শিবের বর্ণনার স্থান অত্যন্ত সীমিত। তাঁর কাব্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এখানে একাধিক স্থানে গদ্য-দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

মৃগলুব্ধ : শিবমহিমা বিষয়ক কাহিনির একটি উপধারা 'মৃগলুব্ধ' নামে পরিচিত। একদা শৈবতীর্থ চট্টগ্রামে 'মৃগলুব্ধ' নামে শিবমহিমা বিষয়ক কয়েকটি পৌরাণিক ধরনের পুথিপুত্র মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের প্রচেষ্টায় পাওয়া গেছে। কী করে একজন ব্যাধ শিবকৃপায় উদ্ধার পেল এবং রাজা মুচকুন্দ এবং তাঁর রানি শিব-চতুর্দশীর ব্রত উপলক্ষ্যে শিবমাহাত্ম্য শুনে সশরীরে স্বর্গে গেলেন 'মৃগলুব্ধে' সেই কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। কাহিনিকার হিসাবে রামরাজা ও রতিদেবের নাম জানা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলি :

খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, 'নিভৃত গিরি-কন্দরে বারিরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, একদিন সেই পাষাণ বেষ্টনী ভেদ করিয়া বারিরাশি নিম্ন অভিমুখে ছুটিয়া চলে অমৃতপ্রপাত রূপে। সেইরূপে ভাগবতের অপূর্ব কাব্যরস লৌকিক ভাষায় নামিয়া আসিল প্রথম বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলিতে। ভাব যেমন প্রবল, প্রতিভাও তেমনি প্রদীপ্ত। এইরূপ শুভযোগেই বৈষ্ণব পদাবলির জয়যাত্রা শুরু হইয়াছিল।' প্রবাদেই রয়েছে 'কানু বিনে গীত নাই'। 'বৈষ্ণব অর্থে বিষ্ণু সম্বন্ধীয়' বোঝালেও, বৈষ্ণব পদাবলি-সাহিত্যে পৌরাণিক বিষ্ণুর কথা নয়, কৃষ্ণলীলা তথা রাধা-কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও প্রাচীন কোনো পুরাণে রাধার উল্লেখ নেই। 'গাথাসপ্তশতী'তে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের আগে রচিত অপভ্রংশ- প্রাকৃত ভাষার একটি রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদের উপস্থিতি দেখে পণ্ডিতদের অনুমান, সেন-আমলের লোক-বাংলাতেই রাধা-প্রেমকথার প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল। প্রাকৃত প্রেমকে বৈষ্ণব কবিরা সহজেই আধ্যাত্মিকতার স্তরে উপনীত করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ থেকেই বৈষ্ণব পদাবলির ধারা শুরু হয়। সেই সময় থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অগণিত বৈষ্ণব কবির রচনায় বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে, বৈষ্ণব পদাবলি হয়ে উঠেছে বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্রেই কবিরা রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। চৈতন্যপূর্বযুগের পদসাহিত্যে বৈষ্ণবচেতনা অপ্রতুল হলেও তাঁর পরবর্তীকালে এক বিশিষ্ট ধর্মীয় চেতনার সুষ্ঠু প্রকাশই পদাবলির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃত', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত', 'গোবিন্দলীলামৃত', 'বিদগ্ধমাধব, জগন্নাথবল্লভ' প্রভৃতি গ্রন্থের ভাবধারা, ঘটনাবিন্যাস চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের রচনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথাগত এই সংস্কারের মধ্যে পদগুলি রচিত হলেও বৈষ্ণব ধর্মের উপাসনা প্রেমধর্মেরই উপাসনা, যা মানুষে মানুষে পার্থক্যকে স্বীকার করে না, শত্রু-মিত্র ভেদ মানে না; তাই এর আবেদনও সর্বজনীন।